কাজের বিজ্ঞান

শ্রীরাধাভূষণ বসু,
বি. এস্‌-সি., বি. কম্‌.

মূল্য ။৵০ আনা

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু–

আমার জীবনের প্রথম প্রচেষ্টার ফল
আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ ক'র্‌লাম—
আমার এই সামান্য ভক্তি-অর্ঘ্য
গ্রহণ করুন।

ভূমিকা

"কাজের বিজ্ঞানে"র কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে মাসিক এবং বার্ষিক "শিশুসাথী"তে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেইগুলো এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধ একত্রে এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম এবং বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন মানুষ এক পা-ও চল্‌তে পারে না ব'ল্‌লেই হয়। আমাদের চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞানের কারসাজি এবং কীর্ত্তি বহু আছে এবং প্রত্যহই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানব-সমাজের অশেষবিধ কল্যাণসাধন হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান-সাধনার ফল মানুষের কি কাজে লাগ্‌ছে এবং লাগ্‌তে পারে তা'রই কিছু এই বইতে বুঝাতে চেষ্টা ক'রেছি। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কোনটি থেকেও যদি কোনও পাঠকের কিছু জ্ঞানলাভ হয়, তা' হ'লেই মনে ক'র্‌ব আমার শ্রম সার্থক।

নানারকম ঝঞ্ঝাট এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি প্রকাশিত হ'য়েছে ; সুতরাং দোষ-ত্রুটী হয়তো কিছু আছেই। আশা করি পাঠক নিজগুণে তা' ক্ষমা করবেন। ইতি—

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

লেখক
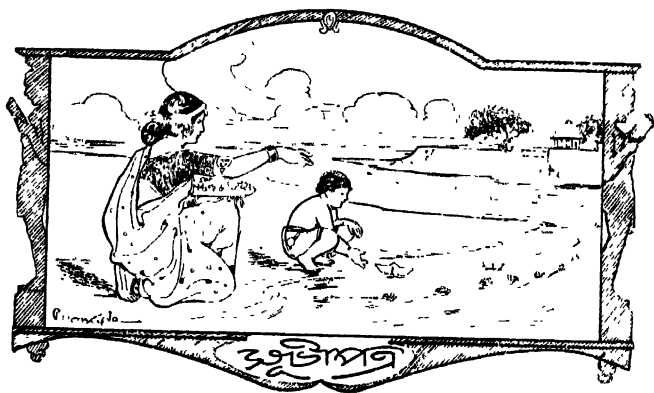
সূচীপত্র

কাজের বিজ্ঞান

ডিনামাইট্

তোমরা অনেকেই হয়তো ডিনামাইটের নাম পর্য্যন্ত শোন নি; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ডিনামাইট্ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ডিনামাইট্ না হ'লে আজকাল চলে না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ডাক্তার আল্‌ফ্রেড্ বি. নোবেল্ (Dr. Alfred B. Nobel) নামক একজন সুইডেনবাসী ডিনামাইট্ আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং রাসায়নিক। তাঁ'র এই আবিষ্কারে তখনকার যুগে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল।

ডিনামাইট্ একপ্রকার রাসায়নিক জিনিষ এবং এইটি একটি বিস্ফোরক ; এর ক্ষমতা অসীম। ডিনামাইট্ জগতের উপকার এবং অপকার দুই-ই ক'রেছে। ডিনামাইট্ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্ব্বত একেবারে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌তে

টানেল্ তৈরী করার জন্য ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় কাটা হচ্ছে

পারে। মাটিতে কূয়া বা গর্ত্ত করার কাজে ডিনামাইট্ লাগে এবং ডিনামাইটের সাহায্যেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের নীচ দিয়ে রাস্তা বা টানেল্ (Tunnel) তৈরী ক'রে আজকাল রেল-গাড়ী চালান হচ্ছে !

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই রকম সুড়ঙ্গ অথবা টানেল্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যা' কেবল ডিনামাইটের

সাহায্যেই সম্ভবপর হ'য়েছে। একশ' বছর পূর্ব্বে যে দেশে যেতে হ'লে প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর দুর্গম পথ দিয়ে যাওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় ছিল না, এখন সেখানে যেতে হ'লে টানেলের ভিতর দিয়ে রেল-গাড়ীতে দিব্য আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে যাওয়া যায়। কোনও কোনও দেশে এই টানেল্ খুব লম্বা,—এমন কি দশ-বার মাইল লম্বা টানেল্ও আছে। ইউরোপে সুইজার্ল্যাণ্ড্ এবং ইটালীর সীমান্তে আল্প্স্ পর্ব্বতের নীচ দিয়ে দুইটি খুব লম্বা টানেল্ আছে—
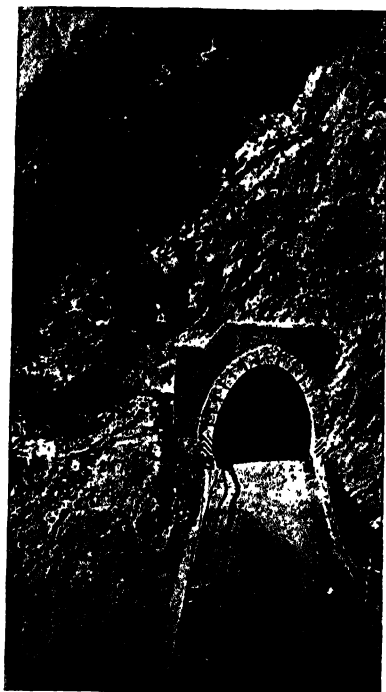
টানেল্

একটির নাম 'সিম্প্লন্' (Simplon), উহা বার মাইল লম্বা; অপরটি ন' মাইল লম্বা এবং তা'র নাম 'সেণ্ট্ গোথাড' (Saint Gothard)। এই সকল টানেল্ ছাড়া সুইজার্ল্যাণ্ড্,

ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড্, ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে পাঁচ-ছ' মাইল লম্বা টানেল্ অনেক আছে।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়নের (Napoleon) নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি যখন তাঁ'র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইউরোপে দিগ্বিজয়ে বা'র হ'য়েছিলেন, তখন তাঁ'কে

নেপোলিয়ন্ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত পার হচ্ছেন

আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে পার হ'তে হ'য়েছিল এবং তা'তে অনেক সৈন্য এবং বহু টাকার রসদপত্র নষ্ট হ'য়েছিল ; কিন্তু তখনকার দিনে এই ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। অথচ সেই সময় হ'তে মাত্র একশ' বছর পরে এখন সেই

আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের নীচ দিয়ে শত-সহস্র লোক বোঝাই ট্রেন প্রত্যহ বিদ্যুৎগতিতে যাওয়া-আসা কর্‌ছে! এই রকম অবস্থা কেবলমাত্র ডিনামাইটের জন্যই সম্ভবপর হ'য়েছে। এখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ থেকে স্থলপথে তিব্বত অথবা চীনদেশে যেতে হ'লে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের উপর দিয়ে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নেই। কিন্তু আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের অবস্থা দেখে মনে হয়, হয়তো খুব শীঘ্রই হিমালয়ের নীচ দিয়ে ট্রেনে ক'রে বিনা ক্লেশে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে যাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষেও টানেল্ অনেক আছে, তবে সেগুলো ইউরোপ প্রভৃতি দেশের টানেলের তুলনায় নিতান্ত ছোট। গয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গেলে টানেল্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একমাত্র ডিনামাইটের কৃপাতেই আজকাল এই সকল টানেল্ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হ'য়েছে এবং ডিনামাইট্ এবিষয়ে জগতের অনেক উপকার ক'রেছে।

কিন্তু ডিনামাইটের আর একটি দিকও আছে এবং সেইটিই এখন প্রধান এবং ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে। ডিনামাইটের সাহায্যে কামান-বন্দুকের গোলা, গুলি প্রভৃতি অনেকদূর পর্য্যন্ত যেতে পারে এবং ডিনামাইটের জন্যই কামান, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে যুদ্ধ করার প্রথা বেশী প্রচলিত হ'য়েছে।

বহু বছর পূর্ব্বে মানুষ প্রধানতঃ তীর, ধনুক, তলোয়ার, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ক'র্‌ত এবং তা'ই নিয়েই সকলে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমে বারুদ আবিষ্কৃত হ'ল এবং

সেই সঙ্গে কামান, বন্দুক প্রভৃতির ব্যবহার সুরু হ'ল,—যদিও তখনকার কামান অথবা বন্দুক মোটেই শক্তিশালী ছিল না। তা'রপর ডিনামাইট্ আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি প্রভৃতির গতি অসাধারণ রকম বৃদ্ধি পেল এবং এই সকল অস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হ'ল। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে, ডিনামাইট্ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে যুগান্তর এনে মানুষের ভীষণ শত্রুরূপে দেখা দিল। সেই হ'তে ডিনামাইটের ব্যবহার এখন পর্য্যন্তও চ'লে আস্‌ছে—যদিও তা'র অপেক্ষা আরও ক্ষমতাশালী অনেক মারাত্মক রাসায়নিক জিনিষ আবিষ্কার করা হ'য়েছে এবং আজকাল অস্ত্রশস্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কি ক'রে আল্‌ফ্রেড্ নোবেল্ ডিনামাইট্ আবিষ্কার ক'রেছিলেন এইবার তোমাদিগকে সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ এখন হ'তে প্রায় একশ' বছর পূর্ব্বে ইউরোপে সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্‌ম্‌এ (Stockholm) আল্‌ফ্রেড্ নোবেল্ জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই নোবেল্ অত্যন্ত রোগা ছিলেন এবং তাঁ'র স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এইজন্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা তাঁ'র খুব বেশী হয় নি। তাঁ'র পিতার, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করার ফ্যাক্টরী (Factory) বা কারখানা ছিল। বাল্যকাল থেকেই নোবেল্ তাঁ'র বাবার কাছে সেই কারখানায় কাজ শিখ্‌তেন। সেই কারখানায় কাজ করার সময়ে নোবেল্ স্থির ক'র্‌লেন যে, ভবিষ্যতে তিনি তাঁ'র বাবার ব্যবসা

চালাবেন। এইজন্য কি উপায়ে অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতি করা যায় সেই সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে তিনি গবেষণা সুরু ক'র্‌লেন। এই গবেষণা করার সময়েই তাঁ'র জীবনের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার—ডিনামাইট্ আবিষ্কৃত হয়।

নোবেল্ যখন বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ ক'র্‌লেন তা'র পূর্ব্বেই নাইট্রো-গ্লিসারিন্ (Nitro-glycerine) নামক এক প্রকার তরল বিস্ফোরক আবিষ্কৃত হ'য়েছিল। নাইট্রো-গ্লিসারিন্ জিনিষটিও ভীষণ মারাত্মক। তোমাদের খুব সম্ভবতঃ জানা আছে যে, বাতাসে অক্সিজেন নামক এক-প্রকার গ্যাস্ আছে। বাতাস ভিন্ন অন্যান্য অনেক রকম জিনিষেও অক্সিজেন আছে। নাইট্রো-গ্লিসারিন্ যদি বাতাসের সংস্পর্শে আসে কিংবা নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌কে যদি এই রকম অক্সিজেনযুক্ত কোনও জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে নাইট্রো-গ্লিসারিন্ ভীষণ শব্দে ফেটে যায় এবং তা' সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্ব্বত—এমন কি, এক একটি নগর পর্য্যন্তও নিমেষের মধ্যে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে পারে। নাইট্রো-গ্লিসারিন্ জিনিষটি কি রকম সাংঘাতিক বিপজ্জনক এবং মারাত্মক তা' বোধ হয় তোমরা বুঝ্‌তে পেরেছ। এইজন্য এই জিনিষটিকে খুব সাবধানের সঙ্গে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে হয়।

নোবেল্ এই নাইট্রো-গ্লিসারিন্ নিয়েই তাঁ'র গবেষণা আরম্ভ ক'র্‌লেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন যে, নাইট্রো-

গ্লিসারিন্ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং মারাত্মক বিস্ফোরক; কিন্তু তরল ব'লে এই জিনিষটিকে কোনও রকম বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করা চলে না, তা'তে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে। তরল ব'লেই সকল সময়ে নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌কে বোতলের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে হয়। যদি কোনও রকমে তা' বোতল থেকে বাইরে আসে এবং বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে যায়, তা' হ'লে কি ভীষণ কাণ্ড হবে তা' আগেই ব'লেছি। অথচ এই জিনিষটি বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার ক'র্‌লে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এইজন্য কি ক'রে নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌কে কাজে লাগানর উপযোগী করা যায় নোবেল্ সেই সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

তিনি যখন তাঁ'র গবেষণা-কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে একদিন দৈবাৎ একটি কাণ্ড ঘ'টে গেল এবং সেই হ'তেই নোবেল্ যা' চেয়েছিলেন তা'ইই পেয়েছিলেন।

একদিন নোবেলের কারখানায় একজন কর্ম্মচারী নাইট্রো-গ্লিসারিন্ বোতলে পূরে প্যাক্ ক'র্‌ছিল। সেই সময়ে হঠাৎ তা'র হাত থেকে একটি বোতল মাটিতে প'ড়ে ভেঙ্গে গেল এবং বোতলের ভিতরকার নাইট্রো-গ্লিসারিন্, মাটির উপর যে বালি ছিল, সেই বালির উপর প'ড়ে গেল। কর্ম্মচারীটি ঐ ব্যাপার দেখে ভয়েই অস্থির—এই বুঝি নাইট্রো-গ্লিসারিন্ বিস্ফোরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কারখানাশুদ্ধ সকল

লোকজন, জিনিষপত্রই একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে যায়! এই রকম মনে হ'তেই লোকটি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

নোবেল্ নিকটেই ছিলেন; তিনি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। সকলেরই মনে ভীষণ ভয় উপস্থিত—এই বুঝি কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে! কি করা যায় কিছুই ঠিক ক'র্‌তে না পেরে নোবেল্ সেই ভাঙ্গা বোতল এবং বালির দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌লেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য,—অনেকক্ষণ কেটে গেল, বিস্ফোরণের নাম-গন্ধও নেই! সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌ল, ব্যাপার কি! নাইট্রো-গ্লিসারিন্ অতক্ষণ বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসেও একেবারে নিরীহ, ভাল মানুষটির মত চুপ ক'রে আছে কেন! তবে কি ঐ বোতলে নাইট্রো-গ্লিসারিন্ ছিল না! কিন্তু ভাঙ্গা বোতলটি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে, বোতলে সত্য সত্যই নাইট্রো-গ্লিসারিন্ ছিল।

তখন নোবেল্ সেই নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌শুদ্ধ বালি অত্যন্ত সাবধানে তাঁ'র পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা সুরু ক'র্‌লেন। ভালরকম পরীক্ষা করার পরে নোবেল্ বুঝতে পার্‌লেন যে, যদি বালি অথবা তরল জিনিষ একেবারে শুষে নিতে পারে এমন অন্য কোনও জিনিষের সঙ্গে নাইট্রো-গ্লিসারিন্ মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঐ ভীষণ বিস্ফোরকটিকে সম্পূর্ণ বশ করা যায় এবং ঐ জিনিষটির সাহায্যেই অন্য প্রকার নূতন ও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বিস্ফোরক

প্রস্তুত করা যাবে। এই রকম সিদ্ধান্ত ক'রে তিনি নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌কে কি ক'রে নিরাপদ্‌ভাবে কাজে লাগান যায় তা'ই নিয়ে আবার গবেষণা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

এই সকল গবেষণার ফলে তিনি দেখ্‌লেন যে, বালির সঙ্গে নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌ মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করা যায় কিন্তু সকল সময়েই তা' হ'তে সন্তোষজনকভাবে কাজ পাওয়া যায় না এবং যে সকল লোক এইভাবে বালির সঙ্গে মিশ্রিত নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌ ব্যবহার ক'র্‌বে তা'দেরও বিপদের আশঙ্কা আছে। এইজন্য তিনি বালির পরিবর্ত্তে একপ্রকার বেলেপাথর (Sand stone) নিয়ে পরীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এই প্রকার বেলেপাথরে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং ইহাকে কাইসেল্‌গার্‌ (Kieselguhr) বলা হয়। কাইসেল্‌গার্‌ ব্যবহার করাতে ফল খুব ভালই পাওয়া গেল এবং বিস্ফোরকটিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিরাপদ্‌ হ'ল। নোবেল্‌ এই বিস্ফোরকটির নাম রাখ্‌লেন ডিনামাইট্‌ (Dynamite)।

নোবেল্‌ যে শুধু ডিনামাইট্‌ আবিষ্কার ক'রেই চুপ ক'রে ব'সেছিলেন, তা' নহে—তিনি নাইট্রো-গ্লিসারিন্‌ নিয়ে আরও অনেকপ্রকার পরীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন এবং গান্‌-কটন্‌ (Gun-cotton) নামক একরকম ভীষণ বিস্ফোরক প্রস্তুত ক'রেছিলেন। গান্‌-কটন্‌, ডিনামাইট্‌ হ'তেও অধিকতর শক্তিশালী এবং বর্ত্তমানে পৃথিবীতে গান্‌-কটনের মত শক্তিশালী বিস্ফোরক খুব কমই আছে। আজকাল কামানের গোলা,

বন্দুকের গুলি প্রভৃতি সকল রকম আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত ক'র্‌তেই গান্‌-কটনের বিশেষ প্রয়োজন।

নোবেলের সারা জীবনই কেটেছিল বারুদ, বিস্ফোরক অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে। তিনি শৈশবে অত দুর্ব্বল এবং রুগ্ন ছিলেন, কিন্তু তা' সত্ত্বেও দেখ তিনি সারা জীবন কি ভয়ানক পরিশ্রম ক'রে এই বিস্ফোরকগুলো আবিষ্কার ক'রেছিলেন। তাঁ'র মনের জোর খুব বেশী ছিল এবং একমাত্র মনের জোরের দ্বারাই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হ'তে পেরেছিলেন।

ডিনামাইটের কথা বল্‌তে গেলে সেই সঙ্গে আর একটি বিষয় সম্বন্ধেও কিছু বল্‌তে হয়। সেই বিষয়টি হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত 'নোবেল্ প্রাইজ' (Nobel Prize)। তোমরা কেহ কেহ হয়তো নোবেল্ প্রাইজের নাম শুনে থাক্‌বে।

ডিনামাইট্ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই সারা জগতে একটা সাড়া প'ড়ে গেল এবং সকলেই নোবেল্‌কে ধন্য ধন্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ডিনামাইট্ বিক্রয় ক'রে ডাক্তার নোবেল্ যথেষ্ট অর্থ পেয়েছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর সময়ে তিনি "উইল" (Will) ক'রে গিয়েছিলেন যে, তাঁ'র উপার্জ্জিত অর্থের সুদ হ'তে প্রতি বছর পাঁচটি ক'রে "প্রাইজ" অথবা পুরস্কার দেওয়া হবে। পাঁচটি বিভিন্ন বিষয়ে যে পাঁচজন লোক প্রতি বছর জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবেন, প্রাইজগুলো তাঁ'রাই পাবেন। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে একটি পদার্থবিদ্যা (Physics), একটি

রসায়ন (Chemistry), একটি শরীর-তত্ত্ব (Physiology) বা ডাক্তারী বিদ্যা (Medicine), একটি সাহিত্য (Literature) এবং পঞ্চমটি শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে (Peace-Making)।

শেষোক্ত বিষয়ে প্রাইজ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ডিনামাইট্ আবিষ্কার হওয়ার পরে যুদ্ধ করার অনেক সুবিধা হ'য়ে গেল এবং সেইসঙ্গে বহু লোকক্ষয়ও হ'তে লাগ্‌ল। তা' দেখে নোবেল্ —যা'তে ডিনামাইটের ব্যবহার ক'মে যায়—সেই উদ্দেশ্যে পঞ্চম প্রাইজটি দিলেন। যিনি যুদ্ধবিগ্রহ এবং তা'র সঙ্গে ডিনামাইটের ব্যবহার বন্ধ ক'রে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ক'র্‌বেন অথবা শান্তি-স্থাপন ক'র্‌তে পার্‌বেন, তিনিই পঞ্চম প্রাইজটি পাবেন। এই রকম ক'রে নোবেল্ ডিনামাইট্ বিক্রয়ের অর্থ জগতের কল্যাণে দান ক'রে গিয়েছেন। তাঁ'র নাম অনুসারেই এই প্রাইজগুলোর নাম 'নোবেল্ প্রাইজ' হ'য়েছে।

প্রত্যেক প্রাইজের মূল্য ৮,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ আমাদের দেশে এখন তা'র মূল্য প্রায় ১,০৬,০০০ টাকা। ডাক্তার নোবেল্ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁ'র মৃত্যুর পর হ'তেই তাঁ'র 'উইল' অনুসারে পাঁচটি ক'রে প্রাইজ—প্রতি-বছর যাঁ'রা পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বিষয়ে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হন,—তাঁ'রাই পেয়ে আস্‌ছেন। যদি কোনও বছর কোনও বিষয়ে কেহ শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত না হন, তা' হ'লে সেই বছর সেই বিষয়ে কোনও প্রাইজ দেওয়া হয় না। পরের বছর যিনি ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হন, তিনিই দুই বছরের টাকা

একসঙ্গে পান। আবার যদি কোনও বছর কোনও একটি বিষয়ে দুইজন লোককে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ব'লে স্থির করা হয়, তা' হ'লে পুরস্কারের টাকা ঐ দুইজনের মধ্যে সমান ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

ডাক্তার নোবেলের মৃত্যুর পর হ'তে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের অনেক মহাজ্ঞানী লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'য়েছেন এবং তা'র নিদর্শনস্বরূপ এই জগদ্বিখ্যাত মূল্যবান্ প্রাইজ পেয়েছেন। আমাদের দেশেও দুইজন মহাজ্ঞানী লোক এই সম্মান পেয়েছেন। প্রথমে বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী কবি এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবিতা এবং সাহিত্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়াতে 'নোবেল্ প্রাইজ' পান। পরে মাদ্রাজী পদার্থবিদ্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেঙ্কট্ রমন্ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হওয়াতে এই পুরস্কার পেয়েছেন।

ড্রাই-সেল্

তোমরা সকলেই টর্চ্চ-লাইট্ (Torch Light) অথবা ইলেক্‌ট্রিক্ হাত-বাতি নিশ্চয়ই দেখেছ এবং খুব সম্ভবতঃ তোমাদের মধ্যে যা'দের বাড়ী পল্লীগ্রামে তা'দের কা'রও কা'রও বাড়ীতে একটি ক'রে টর্চ্চ-লাইট্ আছেই।

আজকাল এই টর্চ্চ-লাইটের এত বেশী প্রচলন হ'য়েছে যে, কি সহর, কি গ্রাম, সকল স্থানেই, হাটে, মাঠে প্রায় সকল লোকের হাতে অথবা পকেটে একটি ক'রে টর্চ্চ-লাইট্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে হয়তো কোথাও যেতে হবে—রাস্তায় ভাল রকম আলো নেই; তেমন অবস্থায় একটি টর্চ্চ-লাইট্ হাতে নিয়ে নির্ভয়ে রাস্তায় বা'র হওয়া যায়। যখনই আলোর প্রয়োজন হবে, পকেট থেকে টর্চ্চ-লাইটটি বা'র ক'রে একটি বোতাম টিপ্‌লেই শাদা ধব্‌ধবে আলো পাওয়া যায়! পথিক সেই আলোতে যেখানে খুসী স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়।

টর্চ্চ-লাইটের দৌলতে এখন আর পূর্ব্বেকার মত একটি বোঝাবিশেষ হারিকেন লণ্ঠন ব'য়ে নিয়ে যেতে হয় না। তা' ছাড়া হারিকেন লণ্ঠন ঝড় কিংবা বৃষ্টিতে নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, টর্চ্চ-লাইটে কিন্তু ওসকল কোনও ভয় নেই।

যতক্ষণ টর্চ্চ-লাইটের কল-কব্জা ঠিক থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র জীবনীশক্তি অর্থাৎ ড্রাই-সেল্ বা ড্রাই-ব্যাটারী ঠিক থাকে ততক্ষণ ঝড়-বৃষ্টিতে নিভে যাওয়ার কোনই আশঙ্কা নেই।

পল্লীগ্রামে রাত্রে চোর-ডাকাতের ভয়ে শোয়ার ঘরে সারারাত্রি প্রদীপ অথবা হারিকেন লণ্ঠনের আলো জ্বালিয়ে রাখ্তে হয়। তা'তে অকারণ বেশী খরচা হয়। তা' ছাড়া রাত্রে শোয়ার ঘরে বায়ু চলাচলের ভালরকম ব্যবস্থা না রাখ্লে শরীরের পক্ষে হানি হয়, কারণ কেরোসিন তেলের গ্যাস্ বিষাক্ত। বদ্ধ ঘরে সমস্ত রাত্রি কেরোসিন তেলের হারিকেন লণ্ঠন জ্বালান থাক্লে অনেক সময়ে বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণহানি পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে। এখন টর্চ্চ-লাইটের কৃপায় এই সকল অসুবিধা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। রাত্রে শোয়ার সময়ে বিছানার পাশে অথবা বালিশের নীচে একটি টর্চ্চ-লাইট্ রেখে নিশ্চিন্তমনে ঘুমান যায়। যখনই আলোর প্রয়োজন হয়, বোতাম টিপ্লেই যথেষ্টরকম আলো পাওয়া যায়। এতে খরচা কম পড়ে এবং কেরোসিন গ্যাসের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

টর্চ্চ-লাইটের গুণাবলী অনেক। টর্চ্চ-লাইট্ হওয়াতে যে কত সুবিধা হ'য়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই এবং তোমরাও সকলেই তা' জান, কিন্তু এই টর্চ্চ-লাইটের জীবনীশক্তি অথবা কাজ করার ক্ষমতা জোগায় ড্রাই-সেল্ (Dry Cell) বা ড্রাই-ব্যাটারী (Dry Battery)। ড্রাই-সেল না হ'লে টর্চ্চ-লাইট্ একেবারেই অচল।

ড্রাই-সেল্ বা ড্রাই-ব্যাটারীর নাম টর্চ্চ-লাইটের নামের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শুধু টর্চ্চ-লাইট্ অথবা শুধু ড্রাই-সেল্ একাকী সম্পূর্ণ অক্ষম; তা'রা দু'জনায় মিলে তবে আলো দেয়। টর্চ্চ-লাইটের নাম যেমন তোমাদের কাছে সুপরিচিত, সেইরকম ড্রাই-সেলের নামও তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালরকম জানা আছে। এই ড্রাই-সেল্ জিনিষটি কি এবং কি ভাবে এইটি প্রস্তুত করা হয় এবার সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'ল্ছি।

প্রথমেই ব'লে রাখি—যদিও এই সেল্ অথবা ব্যাটারীর নাম ড্রাই-সেল্ বা ড্রাই-ব্যাটারী, অর্থাৎ শুক্‌নো ব্যাটারী, প্রকৃতপক্ষে এইটি শুক্‌নো মোটেই নহে—বরঞ্চ এই ব্যাটারীর ভিতরকার মাল-মসলা ভিজা থাকার উপরই তা'র কাজ করার ক্ষমতা এবং তা'র জীবনীশক্তি নির্ভর ক'র্ছে; ভিতরকার মাল-মসলাগুলো একেবারে শুক্‌নো হ'লে সে ব্যাটারী কোনও কাজেই লাগে না।

ছবি দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে কি কি জিনিষ দিয়ে এবং কি ভাবে এই ড্রাই-সেল্ প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ থাকে একটি সরু কার্‌বন্ রড্ (Carbon rod) বা অঙ্গার-লাঠি বিশেষ; তা'র চারদিকে মস্‌লিন্ অথবা পাত্‌লা কাপড়ের একটি থলিতে মান্‌গ্যানীজ্ ডাই-অক্‌সাইড্ (Manganese Dioxide), প্লাম্‌ব্যাগো (Plumbago—কৃষ্ণসীস) এবং আঠা একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন, চট্‌চটে অবস্থায় কার্‌বনের সরু রড্ বা লাঠিটির গায়ে লাগান থাকে। এই মস্‌লিন্ অথবা কাপড়ের

থলিটির চারদিকে সল্-এমোনিয়াক্ (Sal-Ammoniac—নিশাদল জাতীয় জিনিষ), জিঙ্ক্-ক্লোরাইড্ (Zinc chloride—দস্তা বিশেষ) এবং কাঠের গুঁড়ো দিয়ে আর একটি
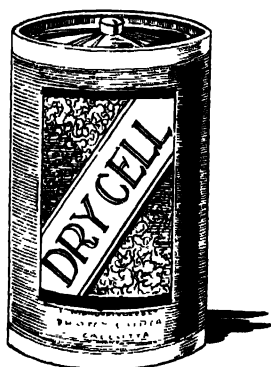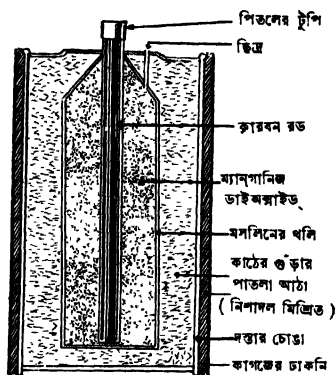
(ক) (খ)

ড্রাই-সেল্

(ক) বাইরের চেহারা (খ) ভিতরে এই সকল জিনিষ থাকে

পাত্‌লা আঠামতন তরল জিনিষ লাগান থাকে ; এই শেষের আঠাটিকে শক্ত করার জন্য প্ল্যাস্‌টার অফ্ প্যারিস্ (Plaster of Paris) নামক শাদা চূণের মত এক রকম গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই জিনিষগুলো ঠিকভাবে সাজিয়ে একটি জিঙ্ক্ অথবা দস্তার সরু চোঙার ভিতর রাখা হয় ; এই চোঙাটির একটি মুখ বন্ধ থাকে। কার্‌বনের সরু লাঠি সমেত সব জিনিষগুলো চোঙার ভিতর দিয়ে, চোঙার

অন্য মুখটি গালা জাতীয় এক রকম জিনিষ দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এইরকমভাবে বন্ধ না ক'র্লে ভিতরকার মাল-মসলা শীঘ্রই শুকিয়ে যায় এবং তা'হ'লে ব্যাটারী কোন কাজেই লাগে না। কেবলমাত্র এমোনিয়া গ্যাস্ (Ammonia Gas) বাইরে যাওয়ার জন্য একটি সরু ছিদ্র থাকে। দস্তার চোঙাটিকে শেষকালে এক টুক্‌রো মোটা এবং শক্ত কাগজে মুড়ে রাখা হয়। কার্‌বনের সরু লাঠিটির মাথায় একটি পিতলের টুপী পরিয়ে দেওয়া হয়।

এই সকল মাল-মসলা ঠিকভাবে লাগান হ'লে তা'দের পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয় এবং তা'রই ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়; এই বিদ্যুৎপ্রবাহেই টর্চ্চ-লাইটের বাল্‌ব্‌ জ্বলে এবং আলো হয়। যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত এই মাল-মসলাগুলো ভিজা থাক্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত তা'দের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চল্‌বে এবং তা'হ'লে টর্চ্চ-লাইট্‌ও জ্বল্‌বে; কিন্তু ব্যবহার করার ফলে এবং বেশীদিনের পুরাণ' হ'লে মাল-মসলাগুলো ক্রমে শুকিয়ে যায় এবং ড্রাই-সেলেরও জীবনের শেষ হয়। তখন আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও টর্চ্চ-লাইট্‌ জ্বলে না—আবার একটি নূতন ড্রাই-সেল্‌ দিলে তবে জ্বল্‌বে।

এখন বোধহয় তোমরা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ যে, নামে ড্রাই অর্থাৎ শুক্‌নো হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এই সেল্‌ ভিজা এবং এই ভিজা অবস্থার উপরই তা'র জীবন নির্ভর ক'রছে;

তবে আমরা বা'র হ'তে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না যে এই সেলের ভিতরটা শুক্‌নো অথবা ভিজা।

ড্রাই-সেল্ প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন থেকে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়; তবে গত ৮।১০ বছর হ'তে এদেশেও ড্রাই-সেল্ প্রস্তুত হচ্ছে এবং এখন আমাদের দেশে ভাল রকমের ড্রাই-সেল্ প্রচুর প্রস্তুত হচ্ছে। টর্চ্চ-লাইট্ এখন পর্য্যন্তও এদেশে কোথাও প্রস্তুত হয় না; তবে শীঘ্রই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বীট্ সুগার

আমরা যে চিনি প্রত্যহ খেয়ে থাকি, তা' প্রধানতঃ আখ হ'তেই প্রস্তুত হয়। এইজন্য এই চিনির নাম আখের চিনি। ক্ষেত হ'তে আখ তুলে আখ্‌মাড়াই কলে বেশ ক'রে পিষে ফেলে আখের রস বা'র করা হয়। তা'র পর সেই রস প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াতে জ্বাল দিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করা হয় এবং তা' থেকেই সুন্দর, শাদা, দানাদার চিনি পাওয়া যায়।
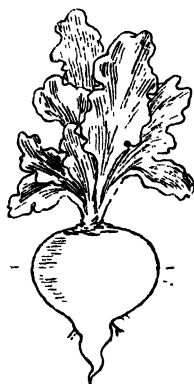
বীট্ পালঙ্

আখের চিনি ছাড়া আর এক রকম চিনিও আজকাল খুব ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চিনির নাম বীট্ সুগার অথবা বীট্ থেকে তৈরী চিনি। এই বীট্ আর কিছুই নহে; যা'কে আমরা চলিত কথায় বীট্ পালঙ্ ব'লে থাকি এবং যে জিনিষ আমাদের দেশে প্রধানতঃ শীতকালেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে—এ সেই বীট্ পালঙ্।

রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, বীট্ পালঙে তা'র ওজনের শতকরা ১২ ভাগ চিনি আছে এবং এই চিনি সহজেই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। বীট্

পালঙ্ হ'তে কি ভাবে চিনি পাওয়া যায় সেই কথাই ব'ল্ছি। বেশ বড় বড় এবং পুষ্ট বীট্ ক্ষেত থেকে তুলে শিকড়, খোসা, পাতা প্রভৃতি ছাড়িয়ে ফেলে সেগুলোকে গোল গোল চাকা ক'রে কাটা হয়। তারপরে সেগুলো জলে সিদ্ধ ক'রে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার রস তৈরী হয়; সেই মিষ্ট রস থেকেই শাদা, সুমিষ্ট চিনি পাওয়া যায়।
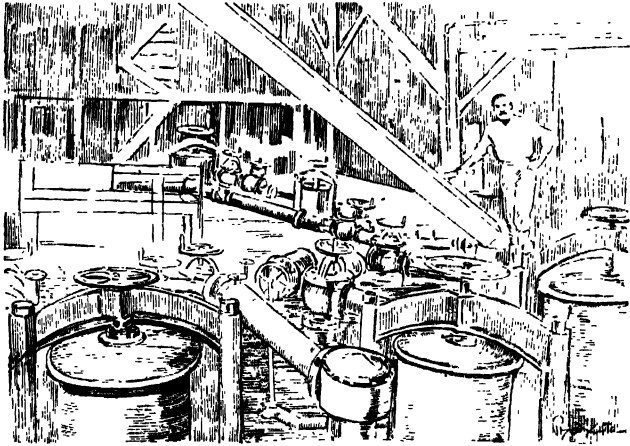
বীট্ সুগার তৈরী করার যন্ত্রপাতি

বীট্ পালঙ্ হ'তে চিনি প্রস্তুত করার উপায় জার্ম্মেণীতেই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স এবং জার্ম্মেণীর মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে জার্ম্ম্যাণ সৈন্যগণের চিনি কম প'ড়ে গিয়েছিল। অন্য দেশ

হ'তে চিনি আমদানীও একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল—চিনি পাওয়ার আর কোনও উপায় ছিল না, অথচ প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে চিনির প্রয়োজন ; না হ'লে যুদ্ধ বন্ধ হ'য়ে যায়। এই অবস্থায় অন্য কোনও উপায়ে চিনি পাওয়া যায় কিনা তা'ই নিয়ে জার্ম্ম্যাণ রাসায়নিক এবং বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা সুরু ক'র্লেন। তাঁ'দের চেষ্টার ফলে শেষে দেখা গেল যে, বীট্ পালঙ্ থেকে সহজেই যথেষ্ট পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় এবং এই চিনি আখের চিনি অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। সেই থেকেই জার্ম্মেণীতে বীট্ পালঙ্ হ'তে চিনি প্রস্তুত করার কাজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল এবং অনেক নূতন নূতন প্রক্রিয়াও আবিষ্কার করা হ'য়েছে।

এখন বীট্ সুগার জার্ম্মেণীর একটি বিশেষ শিল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জার্ম্মেণীর বহু রাসায়নিক, শ্রমিক প্রভৃতি লোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে এবং অনেক টাকার মূলধন এই শিল্পে আছে। জার্ম্ম্যাণ গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

বীট্ পালঙের চাষের জন্য প্রধানতঃ যথেষ্ট রৌদ্র এবং ঠাণ্ডার প্রয়োজন। জার্ম্মেণীর আবহাওয়াই বীট্ পালঙের চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে। এইজন্য জার্ম্মেণীতে বীট্ পালঙের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। বীট্ সুগার প্রস্তুত করার সময়ে বীট্ পালঙের শিকড়, পাতা, খোসা প্রভৃতিও কাজে লাগান হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, বীট্ পালঙে

ভাইটামিন্ অথবা জীবনীশক্তি প্রচুর আছে; সেইজন্য বীট্ পালঙের শিকড়, পাতা, খোসা প্রভৃতি নষ্ট না ক'রে ঘোড়া, গরুকে খাওয়ান হয়। জার্ম্মেণীতেই বীট্ সুগার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং জার্ম্মেণীর লোকেরাই বীট্ সুগার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও জার্ম্মেণীতে বীট্ সুগার এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে, জার্ম্ম্যাণদের চাহিদা মিটানোর পরেও প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে বীট্ সুগার বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদের দেশে এখনও বীট্ সুগার প্রস্তুত করার কোনও ব্যবস্থা নেই। বর্ত্তমানে এদেশে যে চিনি প্রস্তুত হচ্ছে তা' কেবলমাত্র আখের চিনি।

এই সঙ্গে তোমাদিগকে আর একটি জিনিষ সম্বন্ধে দু-চার কথা ব'লে শেষ ক'র্‌ছি। এই জিনিষটির নাম হচ্ছে স্যাকারিন্ (Saccharine)। এই জিনিষটিও চিনির স্বজাতি এবং চিনির মত খুবই মিষ্ট—এত অধিক মিষ্ট যে, পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে আখের চিনি অপেক্ষা স্যাকারিন্ তিনশ' গুণ অধিক মিষ্ট, অর্থাৎ ৩০০ সের আখের চিনিতে যত মিষ্ট হয়, মাত্র একসের স্যাকারিনে ঠিক তত মিষ্ট হবে। স্যাকারিন্ এত মিষ্ট এবং দেখ্‌তে ঠিক আখের চিনি অথবা বীট সুগারের মতই শাদা; কিন্তু কি ভাবে স্যাকারিন্ প্রস্তুত হয় শুন্‌লে তোমরা একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাবে!

আল্‌কাত্‌রা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তা' একেবারে

কুচ্‌কুচে কালো এবং দুর্গন্ধময়! কিন্তু হ'লে কি হয়—রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে এই নিকষ কালো এবং দুর্গন্ধময় আল্‌কাত্‌রা হ'তেই অত মিষ্ট এবং শাদা স্যাকারিন্ প্রস্তুত হয়। আল্‌কাত্‌রা হ'তে প্রস্তুত হয় শুনে তোমরা হয়তো ঘৃণায় নাক সিঁটকাবে এবং মনে মনে ভাব্‌বে যে, কি ক'রে লোকে এই স্যাকারিন্ খায়! কিন্তু স্যাকারিন্ নিত্যকার খাদ্যরূপে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই এবং লোকে তা' করেও না; কারণ খাদ্য হিসাবে আখের চিনি অথবা বীট্ সুগারের তুলনায় স্যাকারিনের কোনই গুণ নেই। স্যাকারিন্ কেবলমাত্র ডাক্তারী ঔষধপত্রে এবং কোনও কোনও রোগে, যখন আখের চিনি অথবা বীট সুগার খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ থাকে, কেবল তখনই ব্যবহার করা হয়।

ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্

গত বছর মুকুল, স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে ফার্ষ্ট ক্লাশে প্রমোশন পেয়েছিল। পরীক্ষায় এত ভাল ফল হওয়াতে মুকুলের কাকা তা'কে একটি সুন্দর রিষ্ট্ ওয়াচ্ (Wrist watch) অর্থাৎ হাত-ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। নূতন বছর স্কুল খুল্‌লে মুকুল সেই ঘড়িটি হাতে লাগিয়ে সোজা ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়ে ফার্ষ্ট বেঞ্চে একটি সিট্ দখল ক'রে ব'স্‌ল। তা'র হাতে ঐ সুন্দর ঘড়িটি দেখে পরেশ, কমল প্রভৃতি বন্ধুরা জিজ্ঞেস ক'র্‌ল,—"কি হে মুকুল, আবার ঘড়ি কিন্‌লে কবে ?"

পরেশ কমলকে ব'ল্‌ল,—"দেখ, দেখ, ঘড়িটি কি রকম! দেখ্‌তে অনেকটা রূপোর মত শাদা, কিন্তু দেখে ত রূপোর ঘড়ি ব'লে মনে হয় না!"

কমল অমনি মুকুলকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল,—"হ্যাঁ ভাই মুকুল, ঘড়িটি কি রূপোর ?"

মুকুল এতক্ষণ বন্ধুদিগের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছিল; সে উত্তর দিল,—"ঘড়িটি আমাকে কাকা দিয়েছেন। এইটি রূপোর নয়, ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের তৈরী।"

মুকুলের কথা শুনে বন্ধুরা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল,—"ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্! সে আবার কি জিনিষ! ঘড়ি ত

কেবলমাত্র সোনা অথবা রূপোরই হয় এতকাল জান্‌তাম; ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্ কি জিনিষ ভাই? কৈ আমরা ত তা'র নামও শুনি নি!"

মুকুল একটু হেসে ব'ল্‌ল,—"ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্ এক রকম লোহা। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত এই জিনিষটি ছিল না, কিন্তু এখন ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের ঘড়ি অনেকই পাওয়া যায়।"

"তাই নাকি!" ব'লে বন্ধুরা ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল।

তোমরাও হয়তো ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের নাম শোন নি; কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্ (Stainless Steel) দেখেছ, অথচ তা'র নাম জান না। ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্ কি জিনিষ এবং কি ভাবে প্রস্তুত হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'ল্‌ছি।

সাধারণ লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ এবং লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে, লোহা এবং ইস্পাতের

জিনিষে দু' দিনেই মরিচা প'ড়ে যায়। লোহার কড়া অথবা হাতা কিংবা ইস্পাতের ছুরী যত পরিষ্কারই রাখা যাক্‌ না কেন, অল্পকাল পরে সে সকল জিনিষে মরিচা ধর্‌বেই। তখন জিনিষগুলো দেখ্‌তে বিশ্রী হ'য়ে যায় এবং খুব অধিক পরিমাণে মরিচা প'ড়্‌লে একেবারেই অব্যবহার্য্য হ'য়ে যায়।

সাধারণতঃ লক্ষ্য ক'র্‌লে দেখা যায় যে, লোহার জিনিষ জলের সংস্পর্শে থাক্‌লে কিংবা স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ায় রাখ্‌লেই মরিচা ধরে। এইজন্য শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালেই লোহার জিনিষে শীঘ্র এবং অধিক মরিচা পড়ে। বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি অত্যন্ত কম হয়। এইজন্য বাঙ্গালাদেশে লোহার জিনিষে যত শীঘ্র মরিচা লাগে ঐ সকল দেশে তত শীঘ্র লোহার জিনিষ নষ্ট হয় না। যদি জল কিংবা বাতাসের সংস্পর্শে লোহার জিনিষ না রাখা যায়, তা' হ'লে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' মোটেই সম্ভব নহে; কারণ জিনিষপত্র ব্যবহার ক'র্‌লেই জল এবং বায়ুর সংস্পর্শে আস্‌বেই।

জল এবং বাতাসের সংযোগে থাক্‌লেই লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষের উপর প্রথমে হল্‌দে অথবা পাট্‌কিলে রংএর একটি দাগ দেখা যায়। ক্রমে সেই দাগ গাঢ় হ'য়ে একটি আস্তরণের মত হয়। আরও কিছুকাল পরে ঐ জিনিষগুলোর গায়ে চকোলেট্‌ রংএর এক রকম গুঁড়ো লেগে থাকে; লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষগুলো এই অবস্থায় একটু

নাড়াচাড়া ক'র্‌লেই দেখা যায় যে, ঐ গুঁড়ো হাতে লেগে গেছে! এই গুঁড়োগুলোর নামই মরিচা; ইংরাজীতে মরিচাকে রাষ্ট্‌ (Rust) বলা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, এই গুঁড়ো-গুলো অথবা মরিচাতে, লোহা এবং অক্সিজেন আছে; এজন্য লোহার মরিচার রাসায়নিক নাম ফেরিক্‌ অক্সাইড্‌ (Ferric Oxide)। লোহার রাসায়নিক নাম ফেরাম্‌ (Ferrum) এবং বাতাসের অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে মিলে মরিচা হয় ব'লে, মরিচার রাসায়নিক নাম ফেরিক্‌ অক্সাইড্‌। এই অবস্থায় যদি ঐ জিনিষগুলো দীর্ঘকাল রেখে দেওয়া যায়, তা' হ'লে সেগুলো ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যদি একবার মরিচা পড়ার পরে লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষগুলো ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়, তা' হ'লে কিছুদিন বেশ ভাল থাক্‌বে; কিন্তু আবার মরিচা লাগ্‌বেই।

লোহা কিংবা ইস্পাতের জিনিষ জল এবং বাতাসের সংস্পর্শে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মরিচার হাত হ'তে কোনও মতেই নিস্তার নেই। জিনিষগুলো নিত্য ব্যবহার ক'র্‌লে এবং ভাল রকম পরিষ্কার রাখ্‌লে শীঘ্র মরিচা পড়ে না—কিন্তু একদিন না একদিন মরিচা লাগ্‌বেই। মরিচা, লোহা অথবা ইস্পাতের প্রধান শত্রু।

ধাতুর মধ্যে লোহা,—বিশেষ ক'রে ইস্পাত সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সামান্য একটি সূচ হ'তে আরম্ভ ক'রে বড়

বড় ইঞ্জিন, জাহাজ বা এরোপ্লেন—সকল রকম অত্যাবশ্যক জিনিষেরই মূলে ইস্পাত, অথচ সেই ইস্পাতের পরম শত্রু হচ্ছে মরিচা! এই মরিচার হাত হ'তে ইস্পাতের জিনিষপত্র রক্ষা করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁ'রা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি—সত্যকার কোনও উপায়ই তাঁ'রা আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেন নি। এজন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত একমাত্র রং-লাগান, রূপো অথবা নিকেলের কলাই করা কিংবা প্রত্যহ ভাল ক'রে পরিষ্কার করা ভিন্ন লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষপত্র কোনও মতেই মরিচার হাত থেকে রক্ষা করা যেত না। কিন্তু রং লাগালে আবার দেখ্‌তে বিশ্রী লাগে; তা' ছাড়া সকল জিনিষেই ত রং করা চলে না অথবা রূপো কিংবা নিকেলের কলাই করাও যায় না, কারণ তা'তে খরচ অধিক লাগে।

এই রকমে বহুদিন পর্য্যন্ত অসুবিধার মধ্যে কাটানর পরে, শেষে রাসায়নিকগণ এক রকম নূতন ইস্পাত আবিষ্কার ক'র্‌লেন; এই ইস্পাতে মরিচা মোটেই লাগে না এবং এই ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র মরিচার হাত হ'তে রক্ষা পায়। এই নূতন ইস্পাতের নাম হ'ল ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীল্ (Stainless Steel) অথবা রাষ্ট্‌প্রুফ্ ষ্টীল্ (Rustproof Steel) অর্থাৎ দাগ এবং মরিচাবিহীন ইস্পাত।

এই মরিচাবিহীন ইস্পাত প্রস্তুত করা খুবই সহজ। সাধারণ ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম্ (Chromium) নামক আর একটি

ধাতুর সামান্য একটু অংশ মিশিয়ে দিলেই মরিচাবিহীন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। মরিচাবিহীন ইস্পাতের আরও একটি নাম আছে; ক্রোমিয়াম্ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় ব'লে এই ইস্পাতকে ক্রোম্-ষ্টীল্ও (Chrome-Steel) বলা হয়। ক্রোম্-ষ্টীলের সাধারণ ইস্পাতের মত সকল গুণই আছে। তা' সত্ত্বেও এই রকম ষ্টীলে সাধারণ ইস্পাতের মত মরিচা পড়ে না। এইজন্য ক্রোম্-ষ্টীলের আদর এবং ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্রোম্-ষ্টীলের একটি বিশেষত্ব এই যে, এই ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষপত্র দেখ্‌তে খুব শাদা হয় এবং একবার রূপোর কলাই ক'র্‌লে বহুদিন থাকে। এইজন্য আজকাল লোকে রূপোর পরিবর্ত্তে ক্রোম্-ষ্টীল্ ব্যবহার ক'র্‌ছে, কারণ রূপোর জিনিষেও কিছুদিন পরে মরিচার মত একটি কালো দাগ লেগে যায়— অবশ্য লোহা বা ইস্পাতে প্রস্তুত জিনিষের মত অত শীঘ্র দাগ ধরে না, কিন্তু ভাল রকম পরিষ্কার না রাখ্‌লে রূপোর জিনিষেও দাগ পড়ে। তা' ছাড়া রূপোর তুলনায় ক্রোম্-ষ্টীল্ দামেও অনেক সস্তা এবং বেশী মজবুত। এই সকল কারণে আজকাল সকল রকম কল-কব্জা, মোটরগাড়ীর কোনও কোনও যন্ত্রপাতি, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, এমন কি হাত-ঘড়ি, পকেট-ঘড়ি প্রভৃতিও ক্রোম্-ষ্টীল্ দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমাদের ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্তও ক্রোম্-ষ্টীল্ প্রস্তুত করার কোনই ব্যবস্থা নেই—হয়তো ভবিষ্যতে হ'তে পারে।

ইলেক্‌ট্রোপ্লেট

সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ (Sonarpur Young Boys) এবং গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব (Gopalganj Sporting Club) এই দুইটি দল 'মহারাজা কাপ্‌' ফুটবল প্রতি-যোগিতায় ফাইনালে (final) উঠ্‌ল। দুইটিই খুব ভাল টীম্‌ (Team) এবং কে যে শেষ পর্য্যন্ত কাপ্‌টি জিত্‌বে তা'ই নিয়ে দিন কতক বেশ একটু হৈ চৈ প'ড়ে গেল। পথে, ঘাটে, চায়ের দোকানে, স্কুলে—সর্ব্বত্রই ঐ এক কথার আলোচনা—'কোন্‌ টীম্‌ জয়ী হবে?'

যাই হোক্‌, খুব বেশী দিন আর অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'ল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিকালবেলা ফুটবল গ্রাউণ্ডে (Ground) দুই দলের খেলা সুরু হ'ল। মাঠে লোক ধরে না—এত ভীড়! শেষ পর্য্যন্ত সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবকে দুই গোলে হারিয়ে মহারাজা কাপ্‌টি নিয়ে "হিপ্‌, হিপ্‌, হুর্‌রে" ক'র্‌তে ক'র্‌তে বুক ফুলিয়ে মাঠ হ'তে চ'লে গেল।

গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণ একেই হেরে যাওয়াতে মন-মরা হ'য়ে ব'সেছিল, তা'র উপর সোনারপুর ইয়ং বয়েজের চীৎকারে তা'দের রাগ আরও বেশী হ'ল। আর চুপ ক'রে না থাক্‌তে পেরে, তা'রা সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলের নিকটে গিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—"তবু যদি কাপ্‌টি রূপোর

হ'ত !······ভারী ত একটা ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ করা কাপ পেয়েছে, তা'র জন্য আবার এত চীৎকার !!"

এই কথা শুনে সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলের সকলেই খুব চ'টে গেল। দুই দলে তখন কথা কাটাকাটি এবং বচসা

সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ 'মহারাজা কাপ্‌'টি নিয়ে "হিপ্‌, হিপ্‌, হুর্‌রে" ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে গেল

আরম্ভ হ'ল। এই বুঝি মারামারি বাধে আর কি! শেষে কয়েকজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তা'দের দুই দলকে থামিয়ে ব'ল্‌লেন, —"এত গোলমালের কি প্রয়োজন! স্যাক্‌রার দোকান ত আর বেশী দূর নয়।······যাওনা, স্যাক্‌রার কাছে গিয়ে যাচাই ক'রে দেখ কাপ্‌টি ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ করা অথবা সত্য সত্যই রূপোর। তা' হ'লেই ত সকল গোলমাল চুকে যায়।"

এই কথা শুনে তখনই দুই দল চ'ল্‌ল স্যাক্‌রার কাছে কাপ্‌টি যাচাই ক'র্‌তে। স্যাক্‌রা তা'র চশমাটি চোখে দিয়ে কাপ্‌টি একটু নেড়েচেড়ে দেখেই ব'লে উঠ্‌ল,—"এ ত
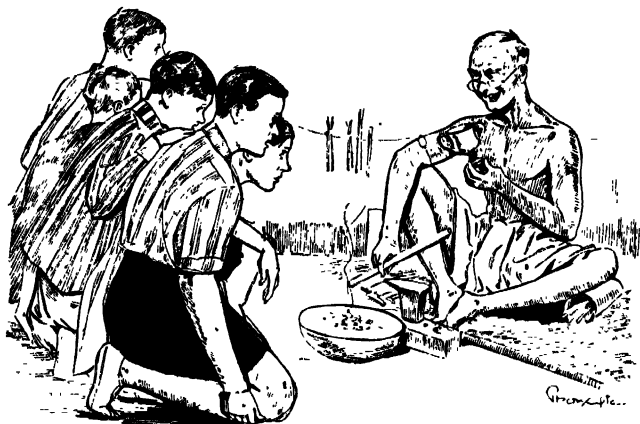
স্যাক্‌রা চশমাটি চোখে দিয়ে কাপ্‌টি একটু নেড়েচেড়ে দেখেই ব'লে উঠ্‌ল,—"এ ত রূপোর তৈরী নহে—এ যে ইলেক্‌ট্রো-প্লেট্‌ অর্থাৎ কলাই করা!"

রূপোর তৈরী নহে—এ যে ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্‌ অর্থাৎ কলাই করা!" আর যায় কোথা, সোনারপুর ইয়ং বয়েজ্‌ দলটি একটু গম্ভীর হ'য়ে সেখান হ'তে চ'লে গেল।

এই রকম রূপোর কলাই করা অথবা সোনার গিল্‌ট্‌ করা জিনিষ তোমরা অনেকেই দেখে থাক্‌বে; কিন্তু কি উপায়ে অথবা কি প্রণালীতে এই রকম কলাই বা গিল্‌ট্‌ করে তা' বোধ হয় তোমাদের জানা নেই। রূপোর কলাই করা মানে—

তামা কিংবা পিতলের জিনিষের উপর রূপোর একটি আবরণ লাগিয়ে দেওয়া—যা'তে ক'রে উপর হ'তে দেখে কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে না যে জিনিষটি রূপোর অথবা পিতলের। সোনার গিল্‌ট্‌ করা মানেও ঠিক তা'ই—রূপো অথবা তামা কিংবা অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্রের উপর সোনার একটি ঢাক্‌না বা আবরণ লাগিয়ে দেওয়া। এই রকম গিল্‌ট্‌ করা জিনিষ দেখে মনে হয় জিনিষটি সোনার, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে জিনিষটি সোনা হ'তে নিকৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত। রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ কি প্রকারে করা হয় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে ব'ল্‌ছি।

বহুকাল পূর্ব্বে, মার্কারী (Mercury) অর্থাৎ পারদ্‌ ধাতুর সাহায্যে রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা হ'ত। যে সকল জিনিষ রূপোর কলাই করার প্রয়োজন হ'ত সেইগুলো প্রথমে বেশ ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে রাখা হ'ত। তা'রপর রূপো এবং পারদ্‌ এই দু'টি ধাতু একত্রে ভাল ক'রে মিশিয়ে ঐ সকল জিনিষের উপর ঢেলে দেওয়া হ'ত, যা'তে ক'রে ঐ জিনিষগুলো এই দু'টি সংমিশ্রিত ধাতুদ্বারা একেবারে ঢেকে যেত। জিনিষগুলো তখন বড় বড় উনান অথবা চুল্লীতে গরম করা হ'ত। এখন, পারদ্‌ ধাতুর একটি গুণ এই যে, একটু গরম ক'র্‌লেই পারদের ভাপ্‌ উঠ্‌তে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ পারদ্‌ একেবারে উপে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। জিনিষগুলো উনানে গরম করার ফলে মিশ্রিত

ধাতু হ'তে পারদের অংশ ক্রমে উপে যেত এবং কেবলমাত্র রূপো প'ড়ে থাক্‌ত। এইভাবে জিনিষগুলোর গায়ে রূপোর একটি আস্তরণ লেগে যেত।

সোনার গিল্‌ট্‌ ক'র্‌তে হ'লে রূপো এবং পারদের পরিবর্ত্তে, সোনা এবং পারদ্‌ একত্রে মিলিয়ে ব্যবহার করা হ'ত। এই ভাবে রূপোর কলাই অথবা সোনার গিল্‌ট্‌ করার প্রথা ব্যয়সাধ্য ছিল এবং শরীরের পক্ষেও হানিকর, কারণ পারদের ভাপ্‌ অথবা ধোঁয়া অত্যন্ত বিষাক্ত। এইজন্য আজকাল আর এই প্রথাতে কলাই বা গিল্‌ট্‌ করা হয় না। আজকাল যে উপায়ে তামা, পিতল বা অন্য ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্রে রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা হয় তা'র নাম ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (Electroplating) এবং এই কাজ পারদের পরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিক্‌ অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে করা হয়।

ইংরাজী ১৮০৩ সালে বিদ্যুতের সাহায্যে কলাই এবং গিল্‌ট্‌ করার প্রথা আবিষ্কার করা হয় এবং যিনি আবিষ্কার করেন তাঁ'র নাম ব্রুগাটেলী (Brugnatelli)। প্রথমে এই নূতন প্রথায় খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়নি এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা কাজে লাগান সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু ব্রুগাটেলীর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টা এবং পরিশ্রম ক'রে এই নূতন প্রথাকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী ক'রেছেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এক্‌লিংটন্‌ (Eklington) নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই নূতন প্রথায় রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা

আবিষ্কার করেন। এখন পর্য্যন্তও সেই উপায়েই রূপোর কলাই এবং সোনার গিল্ট্ করা হচ্ছে। আজকাল কি ভাবে ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং করা হয় তা' এই ছবি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

একটি কাঁচ অথবা চীনেমাটির চৌবাচ্ছা-মত চতুষ্কোণ পাত্রে একভাগ সিল্‌ভার্ (রূপো) সাইনাইড্ (Silver Cyanide) এবং দু'ভাগ পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ (Potassium Cyanide)
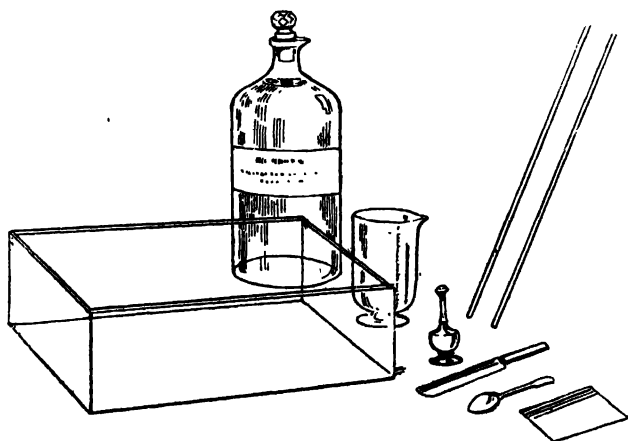
সিল্‌ভার্-প্লেটিং করার জিনিষপত্র

ভাল ক'রে মিশিয়ে পঞ্চাশভাগ পরিষ্কার জলে ঢেলে দেওয়া হয়। পাত্রটির উপরে দু'টি তামার রড্ (rod) অথবা সরু লাঠি আড়া-আড়িভাবে রাখা থাকে। পিতল অথবা তামার ছুরী, কাঁটা, চাম্‌চ্, মেডেল প্রভৃতি যে সকল জিনিষ কলাই করা হবে, সেইগুলো প্রথমে অ্যাসিডে এবং পরে পরিষ্কার জলে

ভাল ক'রে ধুয়ে পাত্রের উপরকার একটি তামার রড্‌ হ'তে তামার তারের সাহায্যে পাত্রের মধ্যে রাসায়নিক তরল পদার্থের ভিতর ঝুলিয়ে রাখা হয়। অপর তামার রড্‌ হ'তে পরিষ্কার, খাদবিহীন এবং খাঁটি রূপোর একটি টুক্‌রো তামার তার দিয়ে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এখন একটি ব্যাটারী এনে তামার তার দিয়ে পাত্রটির উপরকার তামার রড্‌ দু'টির সঙ্গে সংযোগ ক'রে দিলে ব্যাটারী হ'তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Electric current) পাত্রটির ভিতর দিয়ে
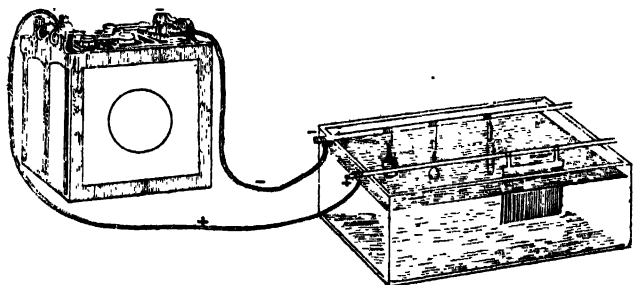
সিল্‌ভার্‌-প্লেটিং করা হচ্ছে

যাতায়াত ক'র্‌বে। ব্যাটারীর দু'টি টার্‌মিনাল্‌ (Terminal) অথবা মুখ থাকে—একটির নাম পজিটিভ্‌ (Positive) টার্‌মিনাল্‌ এবং অপরটির নাম নেগেটিভ্‌ (Negative) টার্‌মিনাল্‌। যে তামার রড্‌ হ'তে কাঁটা, ছুরী, চামচ্‌ প্রভৃতি (অর্থাৎ যে জিনিষগুলো কলাই ক'র্‌তে হবে) ঝুলান আছে সেইটি ব্যাটারীর নেগেটিভ্‌ টারমিনালের সঙ্গে

সংযোগ করা হয় এবং অন্য রড্ অর্থাৎ যেইটি হ'তে রূপোর টুক্‌রো ঝুলান থাকে, সেইটি ব্যাটারীর পজিটিভ্ টার্‌মিনালের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম ব্যবস্থার ফলে ব্যাটারী হ'তে বৈদ্যুতিক শক্তি বা প্রবাহ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে পাত্রের ভিতরে ঝুলান রূপোর টুক্‌রো ক্রমশঃ গ'লে যায় এবং কাঁটা, ছুরী, চামচ্ প্রভৃতি জিনিষগুলোর গায়ে ভালরকমভাবে লেগে যায়। কিছুক্ষণ এইভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালান হ'লে ব্যাটারী খুলে নেওয়া হয় এবং ঐ জিনিষগুলো পাত্র হ'তে তুলে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেল্‌লে কেহই বুঝতে পার্‌বে না যে, সেইগুলো তামা কিংবা অন্য কোনও ধাতুনির্ম্মিত; মনে হবে জিনিষগুলো ঠিক যেন রূপোরই তৈরী!

সোনার কলাই ক'র্‌তে হ'লে পাত্রে সিল্‌ভার্ সাইনাইডের পরিবর্ত্তে গোল্ড্ (সোনা) সাইনাইড্ (Gold Cyanide) দিতে হয়—অন্য সকল ব্যবস্থা সমান থাকে।

ব্যাটারীর পরিবর্ত্তে ডিনামিক্যাল্ ইলেক্‌ট্রিসিটি (Dynamical Electricity) অর্থাৎ যে বিদ্যুতে আমাদের আলো, পাখা, ট্রাম প্রভৃতি চলে, এই প্রকার বিদ্যুৎও ব্যবহার করা যায়। ব্যাটারীতে খরচ বেশী পড়ে ব'লে আজকাল সকল ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং কারখানাতেই ব্যাটারীর পরিবর্ত্তে ডিনামিক্যাল্ ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোনা এবং রূপোর মত আজকাল নিকেল প্লেটিং (Nickel Plating) অথবা নিকেলের কলাইএরও খুব প্রচলন হ'য়েছে। সোনা এবং রূপোর কলাই যে উপায়ে হয় সেই রকমে নিকেলের কলাইও হয়,—কেবল ঔষধপত্র অন্য রকম ব্যবহার ক'র্‌তে হয়।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সাধারণতঃ তামার জিনিসের উপর রূপোর কলাই এবং রূপোর জিনিষের উপর সোনার কলাই বা গিল্‌ট্‌ খুব ভাল রকম হয়। আবার লোহা, নিকেল এবং দস্তার উপর সোনা অথবা রূপোর কলাই ভালরকম হয় না। সেইজন্য লোহা, নিকেল এবং দস্তা, এই তিনটি ধাতুর নির্ম্মিত কোনও জিনিষে সোনা অথবা রূপোর কলাই ক'র্‌তে হ'লে প্রথমে ঐ জিনিষগুলো তামার কলাই ক'রে নিতে হয় এবং পরে রূপোর কলাই অথবা সোনার গিল্‌ট্‌ করা হয়। ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে কলাই করা হয় ব'লে এই প্রথার নাম হ'য়েছে ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং ; যদি রূপোর কলাই করা হয় তা' হ'লে বলা হয় ইলেক্‌ট্রো-সিল্‌ভারিং (Electro-Silvering) এবং সোনার গিল্‌ট্‌ করা হ'লে ইলেক্‌ট্রো-গাইল্‌ডিং (Electro-Gilding) বলা হয়।

এই রূপো এবং সোনার কলাই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না ; ভাল ক'রে ব্যবহার না ক'র্‌লে কিংবা নিত্য পরিষ্কার না রাখ্‌লে এবং ঘাম প্রভৃতি লাগ্‌লে খুব শীঘ্রই উপরের আবরণ অথবা কলাই উঠে যায় এবং তখন ভিতরকার ধাতুর চেহারা বা'র

হ'য়ে পড়ে। তখন জিনিষগুলোর আসল চেহারা ধরা প'ড়ে যায় এবং ঐগুলো আসল কিংবা নকল তা' বুঝ্‌তে আর কষ্ট হয় না।

আজকাল সোনা-রূপোর কলাইএর আদর এবং ব্যবহার খুব বেশী হ'য়েছে। ছুরী, কাঁটা, চামচ্, চায়ের পেয়ালা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম, থালা, যন্ত্রপাতি, খেলাধূলার কাপ্ (Cup), মেডেল প্রভৃতি, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, পিন, এমন কি স্ত্রীলোক-দের গহনা পর্য্যন্ত অসংখ্য পরিমাণে কলাই করা হচ্ছে।

এখন চারদিকেই রূপোর কলাই করা এবং সোনার গিল্ট্ করা জিনিষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাদের প্রত্যেকেরই বাড়ীতে কিছু না কিছু কলাই-করা জিনিষপত্র আছেই। আজকাল আসল অপেক্ষা এই নকল জিনিষেরই আদর বেশী হ'য়ে প'ড়েছে এবং আসল জিনিষ ক্রমশঃ ক'মে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থার একমাত্র কারণ দেশের আর্থিক দুরবস্থা এবং তা'র সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার বৃদ্ধি। আমাদের দেশে লোকের আয় যত ক'মে যাচ্ছে, বাবুয়ানী ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে এখন আর পূর্ব্বেকার মত বেশী পয়সা দিয়ে আসল সোনা-রূপোর জিনিষ কেনার ক্ষমতা নেই—নকল সোনা-রূপোর জিনিষেই সন্তুষ্ট হওয়া ভিন্ন এখন আর উপায় নেই! এইজন্য বাজারে নকল সোনা, নকল রূপোর এখন এত আদর!

এইবার তোমাদিগকে আরও দু'রকম কলাই করার প্রণালী

সম্বন্ধে ব'ল্‌ছি ; একটি হচ্ছে জিঙ্ক্ (zinc) বা দস্তার কলাই এবং অপরটি টিনের কলাই। তোমরা বোধ হয় জান লোহা এবং ইস্পাতে নির্ম্মিত সকল জিনিষেই খুব শীঘ্র মরিচা লাগে এবং ক্রমে সেইগুলো একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, কিন্তু দস্তা হ'তে প্রস্তুত জিনিষপত্রে সহজে মরিচা লাগে না। *এইজন্য* লোহা অপেক্ষা দস্তার জিনিষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু লোহার জিনিষ অপেক্ষা দস্তার জিনিষপত্রের মূল্য বেশী এবং দস্তার জিনিষপত্র কম মজবুত। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা ক'রে আবিষ্কার ক'রেছেন যে, লোহা অথবা ইস্পাতের জিনিষে দস্তার কলাই ক'রে নিলে সেই সকল জিনিষে শীঘ্র মরিচা লাগে না। দস্তা গ'লিয়ে ফেলে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা ক'রে লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষগুলো ভাল ক'রে পরিষ্কার করার পরে সেই গলিত দস্তায় ডুবিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে জিনিষগুলো গলিত দস্তার পাত্র হ'তে তুলে নিলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, লোহা এবং ইস্পাতের ঐ জিনিষগুলোর গায়ে দস্তার একটি আবরণ লেগে গেছে এবং জিনিষগুলো দেখ্‌তেও ঠিক দস্তা হ'তে প্রস্তুত জিনিষেরই মত হ'য়েছে। এইভাবে দস্তার কলাই করার নাম জিঙ্ক্‌প্লেটিং (Zinc Plating) ; এর আর একটি নামও আছে, সেইটি হচ্ছে গ্যাল্‌ভানাইজিং (Galvanizing)।

আজকাল জিঙ্ক্‌প্লেটিং অথবা গ্যাল্‌ভানাইজিংএর আদর খুব হ'য়েছে এবং অনেক রকম লোহা এবং ইস্পাতের জিনিষই জিঙ্ক্‌প্লেটিং করা হচ্ছে ; তা'দের মধ্যে পল্লীগ্রামাঞ্চলে তোমরা

যে সকল ঢেউখেলান টিনের চাল দেখ্‌তে পাও সেইগুলোই প্রধান। এইগুলো কিন্তু আসলে মোটেই টিনের নহে—এইগুলো লোহা হ'তে প্রস্তুত হয় এবং পরে জিঙ্ক্‌প্লেটিং করা হ'য়েছে। এইজন্য এই সকল ঘরের চালের নাম গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌ করোগেটেড্‌ আয়রন্‌ সীট্‌ অর্থাৎ দস্তার কলাই করা ঢেউখেলান লোহার চাদর।

জিঙ্ক্‌প্লেটিংএর মত টিন্‌প্লেটিংএরও (Tin Plating) আজকাল খুব প্রচলন হ'য়েছে। লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত জিনিষপত্র গলিত টিনে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তুলে নিলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, এই সকল জিনিষের গায়ে টিনের একটি আবরণ লেগে গেছে। বাজারে যে সকল পেট্রোল অথবা কেরোসিন তেলের ক্যানেস্ত্রা বা পাত্র প্রভৃতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে সকলই এই ভাবে প্রস্তুত হয়। আজকাল টিন্‌প্লেটেড্‌ অথবা টিনের কলাই করা জিনিষপত্র খুবই ব্যবহার করা হচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে, সোনা এবং রূপোর কলাইএর মত দস্তা কিংবা টিনের কলাই ক'র্‌তে কোনও প্রকার ব্যাটারী অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রয়োজন হয় না।

সোডা

"সোডা" কথাটি নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই শুনেছ এবং সোডা জিনিষটি বোধহয় তোমরা সকলেই চোখে দেখেছ, কিন্তু সোডা কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তা' খুব সম্ভবতঃ তোমাদের জানা নেই। "সোডা" কি উপায়ে পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে সবিশেষ ব'ল্‌ছি।

"সোডা" একটি রাসায়নিক পদার্থ; এই জিনিষটির সত্য-কার নাম সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ (Sodium Carbonate), কিন্তু সাধারণ লোকে অত বড় নাম না ব'লে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্‌কে ছোট ক'রে শুধু "সোডা" (Soda) ব'লে থাকেন এবং সকল লোকের কাছেই সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ "সোডা" নামেই পরিচিত।

পূর্ব্বে, সামুদ্রিক গাছপালা, আগাছা প্রভৃতি পুড়িয়ে ফেলে সেই ছাই হ'তে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ প্রস্তুত করা হ'ত। গ্রীক্ ভাষায় "ক্যালি" (Kali) ব'লে একটি কথা আছে; "ক্যালি" মানে ছাই। এইজন্য প্রাচীন রাসায়নিকগণ সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্‌কে "অ্যাল্‌ক্যালি" (Alkali) ব'ল্‌তেন। সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ মিশর এবং অন্যান্য দেশেও স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ দেখ্‌তে ছাই রংয়ের এবং তা'র নাম "ট্রোণা" (Trona)।

আজকাল সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট, প্রধানতঃ সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Sodium chloride) অথবা লবণ হ'তে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয় এবং এইভাবে "সোডা" প্রস্তুত করার তিনটি উপায় আছে। এই লবণ আর কিছুই নহে—আমরা যে লবণ আমাদের আহারের জন্য নিত্য ব্যবহার করি, সেই জিনিষ। এই তিনটি উপায়ের মধ্যে আজকাল বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা "সোডা" প্রস্তুত করার প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজে লাগান হচ্ছে। তা'র একমাত্র কারণ এই যে, এইভাবে "সোডা" প্রস্তুত ক'র্‌লে খরচা খুব কম লাগে।

গায়ে মাখা এবং কাপড়কাচা সাবান প্রস্তুতের কাজে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করা হয়। তা'ছাড়া কাপড়চোপড় কাচা, জিনিষপত্র পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ঔষধপত্রে এবং আরও অনেক কাজে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ বর্ত্তমানে এত প্রয়োজনীয় জিনিষ হ'য়ে উঠেছে যে, এই জিনিষটি না হ'লে চলে না। এইটি এখন চাল, ডাল, ঘৃত প্রভৃতির মত নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্য সুদূর পল্লীগ্রামেও মুদির দোকানে "সোটা" অর্থাৎ "সোডা" বহু পরিমাণে বিক্রয় হচ্ছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে অনেকেই "সোডা"কে "সোটা" ব'লে থাকে।

সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ জলে গুলে যায় এবং তা'র স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত। অ্যাসিডে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ দিলে "সোডা"

গুলে যেতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদাকারে গ্যাস্ প্রস্তুত হয় ; এই গ্যাসের নাম কারবন্-ডাইঅক্সাইড্ (Carbon Dioxide) অথবা কার্ব্বনিক্ অ্যাসিড্ গ্যাস্। "সোডা" দেখ্তে ধব্ধবে শাদা গুঁড়োর মত।

এইবার তোমাদিগকে আর এক প্রকার "সোডা"র সম্বন্ধে কিছু ব'ল্ছি। কি সহর, কি পল্লীগ্রাম—আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই পানের দোকান অথবা ঔষধপত্রের দোকানে দু' চার ডজন "সোডা"র বোতল দেখ্তে পাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ খেয়ে হয়তো বদ্হজম হ'য়েছে কিংবা শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না, তখন ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন, "একটি 'সোডা' খাও, সব ভাল হ'য়ে যাবে।" অমনি তোমার চাকর চল্ল পানের দোকানে কিংবা ডিস্পেন্সারী বা ডাক্তারখানায় "সোডা"র উদ্দেশ্যে এবং একটু পরেই তিন অথবা চার পয়সা দিয়ে এক বোতল "সোডা" এনে তোমাকে দিল। তুমি বোতলটির মুখ খুলে বোতলের ভিতরকার পানীয় খেয়ে দু' চার বার উদ্গার তুল্লে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ ক'র্লে। মনে মনে ভাব্লে ডাক্তারবাবু সস্তায় বেশ ভাল ঔষধই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন!

তোমরা রেলগাড়ীতে চ'ড়ে এক দেশ হ'তে অন্য দেশে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে প্রতি ষ্টেশনেই ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে "সোডা", "লেমনেডের"র চীৎকারে কান ঝালাপালা হ'য়ে যায় এবং তোমরা হয়তো মনে

মনে ভাব যে, এই "সোডা" জিনিষটি নিশ্চয়ই সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেটেরই স্বজাতি। কিন্তু "সোডা" নামধারী এই জিনিষটির সহিত কাপড়কাচা "সোডা" অর্থাৎ সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেটের কোনই সম্পর্ক নেই। এই "সোডা" প্রস্তুত ক'র্‌তে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ প্রয়োজন হয় না—তবুও এই পানীয়টির নাম হ'য়েছে "সোডা"! এই বস্তুটির পূরা নাম "সোডা-ওয়াটার" (Soda Water), কিন্তু অনেকেই "সোডা-ওয়াটার" না ব'লে সংক্ষেপে কেবলমাত্র "সোডা" ব'লে থাকেন। ফলে, চাকরকে "সোডা" কিনে আন্‌তে ব'ল্‌লে পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিতে হয়, কাপড়কাচা "সোডা" অথবা পানীয় "সোডা"। বিশেষ ভাবে না ব'লে দিলে বুদ্ধিমান চাকর হয়তো পানীয় "সোডা"র পরিবর্ত্তে কাপড়কাচা "সোডা" কিংবা কাপড়কাচা "সোডা"র পরিবর্ত্তে পানীয় "সোডা" এনে হাজির ক'র্‌বে।

পানীয় "সোডা" অথবা 'সোডা-ওয়াটার' কি প্রকারে প্রস্তুত হয় ব'ল্‌ছি। পূর্ব্বে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ এবং অ্যাসিডের রাসায়নিক সম্মিলনে পানীয় "সোডা" প্রস্তুত হ'ত; হয়তো এইজন্যই পানীয় "সোডা"র নাম 'সোডা-ওয়াটার' হ'য়েছে। কিন্তু আজকাল পানীয় সোডা প্রস্তুত ক'র্‌তে সোডিয়াম্ কার্ব্বোনেট্ মোটেই লাগে না। এখন কারবন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসের সাহায্যে পানীয় সোডা প্রস্তুত হয়। কাঁচের বোতলে পানীয় জল এবং ঔষধ দিয়ে একটি যন্ত্রের সাহায্যে তা'র মধ্যে কারবন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয় এবং পরে আর একটি

যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের মুখে টিনের ঢাক্‌নী পরান হয়। আর এক রকম সোডা-ওয়াটারের বোতলও দেখ্‌তে পাওয়া যায়; এই বোতলগুলোর গলা সরু এবং মুখে কাঁচের একটি গোল গুলি অথবা ছিপি থাকে। এইগুলোর মুখ বন্ধ ক'র্‌তে কোনও প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হয় না—বোতলের ভিতরে কারবন্‌-ডাই-অক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ ভর্ত্তি ক'রে দিলেই বোতলের ভিতরকার গ্যাস্‌
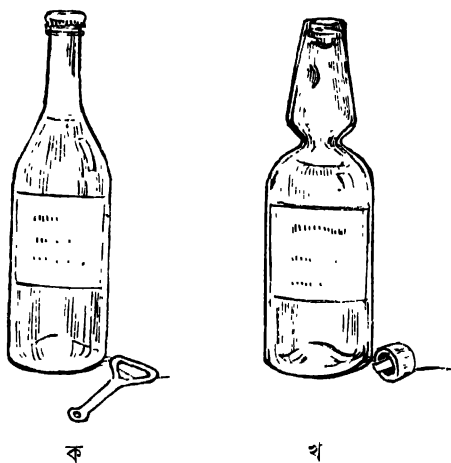
ক—আজকালকার সোডা-ওয়াটারের বোতল এবং বোতল খোলার চাবি

খ—পূর্ব্বেকার সোডা-ওয়াটারের বোতল এবং বোতল খোলার যন্ত্র

জোরে বাইরে আস্‌তে চেষ্টা করে এবং সেই সময়ে কাঁচের গুলি অথবা ছিপি আপনিই বোতলের গলা হ'তে একেবারে মুখে লেগে যায়। এই রকম কাঁচের গুলিওয়ালা, গলা সরু সোডার

বোতল আজকাল বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না ; কারণ, এই রকম সোডার বোতলগুলো খোলার সময়ে প্রায়ই বোতল ফেটে চৌচির হ'য়ে যেত এবং যে সকল লোকেরা বোতল খুল্‌ত তা'রাও অনেকেই জখম হ'ত—এমন কি মারা পর্য্যন্ত যেত। এইজন্য আজকাল মুখে টিনের ঢাক্‌নীওয়ালা সোডার বোতলই
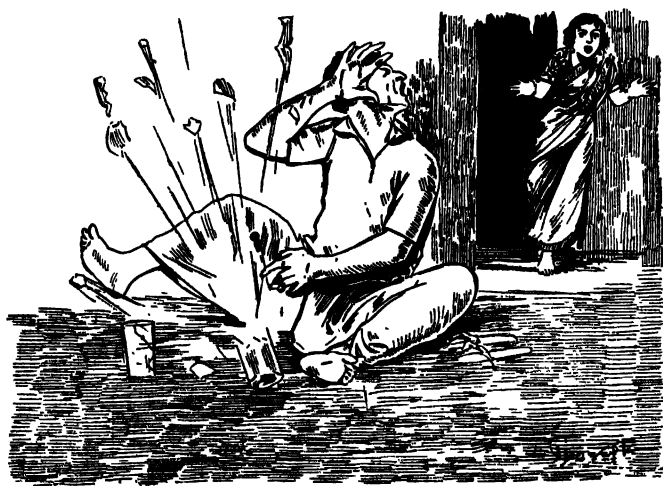
পূর্ব্বেকার সোডা-ওয়াটারের বোতল খুল্‌তে গিয়ে এই রকম অবস্থা প্রায়ই ঘ'ট্‌ত

খুব বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এইভাবে সোডা-ওয়াটার প্রস্তুত করার প্রথা পূর্ব্বেকার প্রথা হ'তে অনেক সস্তা, কারণ আজকাল কারবন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কারবন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাসের সাহায্যে সোডা

ওয়াটার প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানাপ্রকারের সোডা-ওয়াটারের কল এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হচ্ছে।

সোডা-ওয়াটার প্রস্তুত করার প্রণালী তোমরা এখন জান্‌তে পেরেছ এবং এই হ'তে তোমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ যে, সকল সময়েই নামের সঙ্গে সত্যকার জিনিষটির কোনও সম্বন্ধ থাকে না—যেমন কলিকাতার লালদীঘি; লালদীঘি নাম শুনে মনে হয় বুঝি বা এই দীঘির জল একেবারে লাল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যা'রা লালদীঘি দেখেছ তা'রা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছ যে, এই দীঘির জল অপরাপর দীঘির জলেরই মত। লালদীঘির জলের কোনই বিশেষত্ব নেই। আবার সিংহল দ্বীপটিকে অনেক সময়ে "লঙ্কা" দ্বীপ বলা হয়। "লঙ্কা" দ্বীপ নাম শুনে মনে হয় বুঝি এই দ্বীপে কেবল লঙ্কাই পাওয়া যায় এবং সেইজন্যই এই দ্বীপটির ঐ রকম নামকরণ হ'য়েছে; কিন্তু আসলে এইরূপ ধারণা হওয়ার কোনও কারণ নেই। "লঙ্কা" দ্বীপে কেবল লঙ্কা মেলে না—লঙ্কা ছাড়া আরও বহু প্রকার জিনিষই পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও তা'র নাম রাখা হ'য়েছে "লঙ্কা" দ্বীপ!

বায়ু এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগৎ

তোমরা বোধহয় জান আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন, সেই রকম বিশুদ্ধ অক্সিজেন (Oxygen) গ্যাসেরও একান্ত প্রয়োজন। অক্সিজেন গ্যাস্ না হ'লে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং তা' হ'লে আমাদের দেহের ফুস্‌ফুস্ অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যায়; ফলে আমাদের হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায় এবং তখন আমরা বেঁচে থাক্‌তে পারি না। অতএব তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ আমাদের জীবন-ধারণের জন্য কেবলমাত্র আহার বা পানীয় হ'লেই চলে না —যথেষ্ট রকম বিশুদ্ধ অক্সিজেনেরও বিশেষ প্রয়োজন। অক্সিজেনের উপর শুধু মানুষ কেন, সকল রকম প্রাণীরই জীবন নির্ভর ক'র্‌ছে। অক্সিজেন বিনা কোনও প্রাণীর বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

এই অক্সিজেন, বাতাস হ'তে আমরা নিয়ে থাকি। বাতাসে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস্ আছে। আমরা যখন শ্বাস নিয়ে থাকি তখন বাতাসের এই অক্সিজেন আমাদের ফুস্‌ফুসের ভিতর যায়, কিন্তু যখন আমরা শ্বাস ত্যাগ করি অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলি, তখন ফুস্‌ফুস্ হ'তে নাকের ছিদ্র দিয়ে সে গ্যাস্ বা'র হয়। সেইটি আর অক্সিজেন গ্যাস্ থাকে না—সেইটি অন্য গ্যাস্ এবং তা'র নাম কার্‌বন্-ডাই-অক্সাইড্ (Carbon Dioxide)। এই গ্যাস্ যে কার্‌বন্-

ডাইঅক্সাইড্ তা' অত্যন্ত সহজেই প্রমাণ করা যায় এবং তোমরা নিজেরাও তা' প্রমাণ ক'র্‌তে পার। রাসায়নিকগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে যে, পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ চূণের জলের ভিতর দিয়ে এই গ্যাস্ ছেড়ে দিলে একটু পরেই পরিষ্কার চূণের

আমাদের নিঃশ্বাসে কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ আছে তা'ই প্রমাণ করা হচ্ছে

জল ক্রমশঃ ঘোলাটে হ'য়ে শেষে দুধের মত শাদা হ'য়ে যায়। তোমরা একটি কাঁচের গেলাসে পরিষ্কার চূণের জল নিয়ে, একটি সরু কাঁচের নল অথবা পাটকাঠির সাহায্যে মুখ দিয়ে ফুস্‌ফুস্ হ'তে গ্যাস্ ছাড়্‌তে থাক। গেলাসের চূণের জলে ক্রমাগতঃ বুদ্বুদ্ উঠ্‌তে থাক্‌বে এবং ক্রমশঃ পরিষ্কার চূণের জল ঘোলা

হ'য়ে একেবারে দুধের মত শাদা হ'য়ে যাবে। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা যখন ফুস্‌ফুস্‌ হ'তে গ্যাস্‌ ছেড়ে দিই তখন যে গ্যাস্‌ বা'র হয় সেইটি কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌। তোমরা নিজেরাই এই পরীক্ষাটি অনায়াসে ক'রে দেখ্‌তে পার।

মানুষের মত অপরাপর প্রত্যেক প্রাণীই জীবন ধারণের জন্য তা'দের শ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাস্‌ গ্রহণ ক'র্‌ছে এবং তা'দের ত্যক্ত শ্বাসের সঙ্গে কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ বা'র হচ্ছে। প্রাণি-জগতের প্রত্যেক জীবিত প্রাণীকেই এইভাবে অক্সিজেন নিতে হয় এবং তা'দের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ তা'দের ফুস্‌ফুস্‌ হ'তে বাইরে আসে ও বাতাসে মিশে যায়।

কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ আর এক উপায়েও দিবারাত্রি বহু পরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছে এবং বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা চোখে তা' কিছুই দেখ্‌তে পার্‌ছি না অথবা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কাঠ বা কয়লার উনানে আগুন জ্বাল্‌বা-মাত্রই সেই জ্বালানি কাঠ অথবা কয়লা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে এবং তা'তে কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ প্রস্তুত হয়। আবার মরা গাছপালা এবং পশুপক্ষীর মৃত-দেহও বাতাসের সংস্পর্শে ক্রমশঃ প'চে যায় এবং এইরকমে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে গিয়ে কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ প্রস্তুত করে।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ কোটি জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তেই তা'দের ফুস্‌ফুস্‌ হ'তে কার্‌বন্‌-

ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ বা'র ক'র্‌ছে। আবার প্রত্যহই কত শত কোটি জ্বলন্ত উনান এবং মরা গাছপালা ও পশুপক্ষীর মৃতদেহ হ'তেও প্রচুর পরিমাণে কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ প্রস্তুত হচ্ছে! এই সমস্ত কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ই বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

এইরকমে দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, প্রতি সেকেণ্ডেই কি বৃহৎ পরিমাণ কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেই গ্যাস্ বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাতাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভাগ ক্রমশঃ কমিয়ে দিচ্ছে! অথচ প্রাণিজগতের প্রত্যেকেরই বাঁচ্‌তে হ'লে কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্-মুক্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেনের প্রয়োজন। আবার উনান, বাতি অথবা আলো প্রভৃতি জ্বাল্‌তে হ'লেও অক্সিজেনের প্রয়োজন। কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ একটি বিষাক্ত গ্যাস্; মানুষ অথবা পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ কেহই এই গ্যাসে বাঁচে না, এই কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই ব'লেছি এবং উনান প্রভৃতিও কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসে নিভে যায়। এখন তোমরা প্রশ্ন ক'র্‌তে পার কিংবা নিজেদের মনে মনে ভাব্‌তে পার যে—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং এই কোটি কোটি জ্বলন্ত উনান, বাতি প্রভৃতিতে আকাশের বায়ুর সমস্ত অক্সিজেনই ত নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হ'য়ে গিয়ে তা'র পরিবর্ত্তে থাক্‌বে কেবলমাত্র কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্—সমস্ত বিশ্বই এই বিষাক্ত গ্যাসে পূর্ণ হ'য়ে যাবে! তা' হ'লে আমরা বাঁচ্‌ব কি ক'রে এবং পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গই বা বেঁচে থাক্‌বে কি ক'রে? অথচ আমরা ত সকলেই

বেঁচে আছি—শ্বাস নিতেও ত কোনও কষ্ট বোধ ক'র্‌ছি না! আমাদের চতুর্দ্দিকে কীটপতঙ্গও ত অসংখ্য বেঁচে আছে দেখ্‌ছি! তবে এ কি ক'রে সম্ভব হয়!

ব্যাপারটি প্রথমে সত্যই খুব আশ্চর্যজনক ব'লে মনে হয় —আমাদের চতুর্দ্দিকে বিষাক্ত কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ র'য়েছে, তা'র মধ্যে আমরা কি ক'রে বেঁচে আছি! কিন্তু কি ক'রে আমাদের চতুর্দ্দিকে বিষাক্ত কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ থাকা সত্ত্বেও আমরা এবং প্রাণিজগতের সকলেই স্বচ্ছন্দে এবং নিশ্চিন্ত-মনে বেঁচে আছি, সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'ল্‌ছি।

উদ্ভিদ্‌জগতের প্রত্যেককে অর্থাৎ গাছপালা প্রভৃতিকে বাঁচ্‌তে হ'লে প্রধানতঃ বাতাসের কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর ক'র্‌তে হয়। তা'দের জন্য কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ প্রয়োজন। তা'রা যে শ্বাস লওয়ার জন্য কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর করে, তা' নহে—তা'রা অন্য উপায়ে এই গ্যাস্‌ ব্যবহার করে। গাছপালার মধ্যে "ক্লোরোফিল্‌" (Chlorophyl) নামক একটি জিনিষ আছে; ক্লোরোফিল্‌ থাকার জন্যই গাছের পাতার রং সবুজ হয়। এই ক্লোরোফিল্‌, সূর্য্যের আলোতে বাতাসের কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌কে বিশ্লেষণ ক'রে অর্থাৎ ভেঙ্গে ফেলে, তা' হ'তে কার্‌বন্‌ এবং অক্সিজেন পৃথক্‌ ক'রে দেয়। কার্‌বন্‌-ডাইঅক্সাইড্‌ গ্যাস্‌ এইভাবে মুক্ত হ'লে তা'র মধ্যেকার কার্‌বনের অংশটুকু গাছ এবং উদ্ভিদ্‌জগতের সকলেই আপন আপন দেহ পুষ্ট করার জন্য খেয়ে ফেলে এবং বাকী

থাকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন। এই অক্সিজেন আবার পূর্ব্বেকার মত বাতাসে মিশে যায় এবং মানুষ অথবা কীটপতঙ্গ স্বচ্ছন্দে সেই অক্সিজেন শ্বাস লওয়ার জন্য ব্যবহার ক'র্‌তে পারে।

এইরকম প্রক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন বিশ্বশুদ্ধ মানুষ এবং প্রাণিজগতের সকলে মিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত কার্‌বন্-ডাইঅক্সাইড্ প্রস্তুত ক'র্‌ছে আর একদিকে তেমন পৃথিবীর উদ্ভিদ্‌জগতের সকলে সেই বিষাক্ত গ্যাস্ হ'তে নিজেদের দেহ পুষ্ট করার জন্য কার্‌বনের অংশটুকু খেয়ে ফেলে' মানুষ ও প্রাণিজগতের শ্বাস লওয়ার জন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেন মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। এই বিষয়ে মানুষ এবং প্রাণিজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগতের কত নিকট সম্বন্ধ র'য়েছে এবং উদ্ভিদ্-জগৎ প্রাণিজগতের যে উপকার ক'র্‌ছে তা' আমরা বুঝ্‌তে বা জান্‌তে পারি না ; সকলই আমাদিগের অগোচরে এবং অজান্তে হ'য়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে গাছপালা এবং উদ্ভিদ্ প্রভৃতি না থাক্‌লে যে প্রাণিজগতের আজ কি অবস্থা হ'ত এবং আমাদের ঘরবাড়ীর আশেপাশে গাছপালা থাকার কত প্রয়োজন আছে তা' তোমরা এখন ভালরকমই বুঝ্‌তে পার্‌ছ। তোমরা হয়তো আগে মনে ক'র্‌তে যে পৃথিবীতে এত অসংখ্য রকম গাছপালা থাকার প্রয়োজন কি ! কিন্তু এখন দেখ্‌তে পার্‌ছ যে, উদ্ভিদ্ হ'ল মানুষ এবং প্রাণিজগতের সকলেরই বন্ধু। এইজন্যই লোকে বলে, "ভগবান্ যা সৃষ্টি করেন তা' সকলই মঙ্গলের জন্য।"

কচুরীপানা

সুনীলের বাড়ী কলিকাতায়। এই কলিকাতাতেই তা'র জন্ম হ'য়েছিল এবং বরাবর সে কলিকাতার স্কুলেই লেখাপড়া ক'রেছে। সুনীলের স্বভাবটা একটু কুনো অর্থাৎ সে বড় একটা বাড়ীর বা'র হয় না এবং কা'রও সঙ্গে তা'র বিশেষ বন্ধুত্বও নেই। গত বছর সে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দিয়েছিল। ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার পরে তিন-চার মাস ছুটী—আর স্কুলে যেতে হয় না কিংবা কোনও কাজও ক'র্‌তে হয় না—বেশ মজা! এই ভাবে কয়দিন কেটে যাওয়ার পরে সুনীলের বাবা তা'কে ব'ল্‌লেন,—"এখনও ত ছুটীর অনেক দিন বাকী আছে, এইভাবে সময় কাটিয়ে কি হবে! তা'র চেয়ে বরং একবার দেশে বেড়িয়ে আয়। কখনও ত দেশে যাস্ নি! দেশে গেলে কত কি নূতন জিনিষ, নূতন জায়গা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে!"

বাবার এই কথা শুনে সুনীলের খুব আহ্লাদ হ'ল। সে খুসী হ'য়ে তখনই দেশে যাওয়ার জন্য জিনিষপত্র গোছাতে আরম্ভ ক'র্‌ল। দেশে যাওয়ার আনন্দে তা'র আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না—যেন তখনই যেতে পার্‌লে হয় এইরকম অবস্থা! কিন্তু তা'র মা একটি ভাল দিন না দেখে কিছুতেই পাঠাতে রাজী হ'লেন না, কাজেই সুনীলকে বাধ্য হ'য়ে আরও দু'-চারদিন অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'ল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, পাঁজী দেখে, শুভক্ষণে সুনীল, বাবা এবং

মা'কে প্রণাম ক'রে তা'র ছোট সুট্‌কেস্‌টি চাকরের মাথায় দিয়ে তা'দের দেশ দেবগ্রামের উদ্দেশ্যে বা'র হ'য়ে প'ড়্‌ল।

শেয়ালদহ ষ্টেশনে এসে চাকরকে বিদায় দিয়ে সুনীল একখানা টিকিট কিনে ট্রেনের একটি কামরায় ঢুকে একটা বেঞ্চের উপর ব'সে পড়্‌ল। বেলা আড়াইটার সময়ে ট্রেন শেয়ালদহ ষ্টেশন হ'তে ছাড়্‌ল। সুনীলও আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে কামরার ধারে জানালা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে চারদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরেই বাড়ী, ঘর প্রভৃতি লোকালয় ছেড়ে ট্রেন মাঠ, ধানের ক্ষেত, পুকুর, বিল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভীমবেগে ছুটে চ'ল্‌ল। সুনীল চারদিকের নূতন নূতন দৃশ্য দেখে একেবারে অবাক্ হ'য়ে থাক্‌ল। রেল লাইনের আশে-পাশের সকল জিনিষ এবং সকল দৃশ্যই তা'র কাছে নূতন মনে হ'তে লাগ্‌ল; সে ইতিপূর্ব্বে সেই সকল কিছুই দেখে নি। একটি ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌বামাত্র সুনীল দেখ্‌তে পেলে যে ঐ ষ্টেশনের পাশেই একটি প্রকাণ্ড পুকুর একরকম ছোট সবুজ গাছে একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে ঢেকে গেছে—পুকুরের জল মোটেই দেখা যায় না। আবার ঐ সকল সবুজ গাছের মাথায় চূড়ার মত ফিঁকা বেগুনী রংএর অসংখ্য ফুল ফুটে পুকুরটিকে যেন একেবারে আলো ক'রে রেখেছে; পুকুরে ঐ রকম গাছ এবং ফুল সুনীল কখনও দেখে নি। সে একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, "আচ্ছা মশাই! পুকুরে যে ফুলগুলো ফুটে র'য়েছে তা'র নাম কি? বেশ সুন্দর ফুল—পুকুরটিকে যেন সাজিয়ে রেখেছে!"

সহযাত্রীটি তা'র এই প্রশ্ন এবং কথা শুনে একটু হেসে ব'ল্লেন,—"তা' আর জাননা বুঝি! তোমরা সহরের ছেলে—কি ক'রেই বা জান্বে! পুকুরে ঐ যে ছোট ছোট গাছগুলো দেখ্ছ তা'র নাম কচুরীপানা এবং বেগুনী রংএর ফুলগুলো ঐ কচুরীপানারই ফুল।"

কচুরীপানার নাম শুনে সুনীল একটু বিস্মিত হ'ল; মনে মনে ভাব্ল ঐটি আবার কি পদার্থ! গাড়ীর আর একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করাতে তিনিও ব'ল্লেন যে ঐগুলো কচুরীপানা।

সুনীলের মত যে সকল ছেলেরা কেবল সহরেই বাস করে এবং যা'রা কখনও সহরের বাইরে যায় নি তা'দের কাছে কচুরীপানা একটি একেবারে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। সহরের ছেলেরা কচুরীপানা দেখা ত দূরে থাকুক, কচুরীপানার নাম পর্য্যন্তও বোধহয় শোন নি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যা'দের বাড়ী পল্লীগ্রামে তা'রা কচুরীপানা নিশ্চয়ই দেখেছ। কা'রও কা'রও বাড়ীতে হয়তো পুকুরেই এই জিনিষটি প্রচুর পরিমাণে হ'য়ে আছে। এই কচুরীপানা সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'ল্ছি।

কচুরীপানা একরকম আগাছাবিশেষ। পুকুর, বিল প্রভৃতি জলাশয়ে শেওলা, কলমী শাক ইত্যাদি নানাপ্রকার আগাছা জন্মায় এবং এই সকল আগাছাকে চলিত কথায় "পানা" বলা হয়। কচুরীপানা তা'দেরই মত একরকম আগাছা অথবা "পানা", কিন্তু পাতাগুলো কচুরীর মত দেখ্তে ব'লেই তা'র

নাম হ'য়েছে কচুরীপানা। কচুরীপানার ইংরাজী নাম ওয়াটার হায়াসিন্থ্ (Water Hyacinth)। কচুরীপানার ভায়োলেট্ (Violet) অর্থাৎ ফিঁকা বেগুনী রংএর একপ্রকার ফুল হয়

কচুরীপানা

এবং দূর হ'তে এই ফুলগুলো দেখ্তে বড়ই সুন্দর। এইজন্য ইংরাজীতে কচুরীপানাকে মরগ্যান্ ফ্লাওয়ার্ (Morgan Flower) বলা হয়।

পূর্ব্বে কচুরীপানা বাঙ্গালাদেশে ছিল না। কেহ কেহ বলেন,

ব্রাজিল (Brazil) দেশে উহার জন্মস্থান; আবার কেহ কেহ বলেন, কচুরীপানা চীনদেশ হ'তে এই দেশে এসেছে। কচুরীপানার জন্মস্থান যেখানেই হোক্ না কেন, বাঙ্গালাদেশে কচুরীপানা পূর্ব্বে জন্মাত না—এমন কি ২০।২৫ বছর পূর্ব্বেও

কচুরীপানা-পূর্ণ প্রকাণ্ড বিল

বাঙ্গালাদেশের কোথাও কচুরীপানা দেখ্‌তে পাওয়া যেত না। কিন্তু এই ক' বছরেই কচুরীপানা খুব ছড়িয়ে প'ড়েছে। ডোবা, পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিল—সকল জলা জায়গাতেই কচুরীপানা জন্মায়, বিশেষতঃ যে সকল নদী অথবা খাল-বিল প্রভৃতিতে স্রোত মোটেই নেই এবং যেগুলো একেবারে ম'জে

গেছে, সেইখানেই কচুরীপানার জন্মস্থান। এক একটি খাল অথবা পুকুরে কচুরীপানা এত বেশী জন্মায় যে, তা'র উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কখনও কখনও বা দেখ্‌তে পাওয়া যায় এক ঝাঁক কচুরীপানা নদীর স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চ'লেছে এবং তা'ই দেখে মনে হয় নদীর উপর যেন একটি "ভেলা" চ'লে যাচ্ছে।

বর্ষাকালে নদী কিংবা খালে জল বেশী হ'লে জলের স্রোতের বেগে কচুরীপানা ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে যায় এবং এই সময়ে অনেক নদীতে অথবা খালে কচুরীপানা বড় একটা থাকে না। কিন্তু তা'দের শিকড় থেকে যায় এবং বর্ষার শেষে সেই শিকড় হ'তে আবার নূতন কচুরীপানা জন্মায় এবং তা'তেই নদী, খাল, বিল প্রভৃতি আবার কচুরীপানায় ভর্ত্তি হ'য়ে যায়।

কচুরীপানার জন্য বাঙ্গালাদেশের অনেক বড় বড় নদী, খাল প্রভৃতি একেবারে ম'জে গেছে এবং এখনও ম'জে যাচ্ছে। এই সকল নদী, খাল, বিল, পুকুরের জল একেবারেই খারাপ হ'য়ে গিয়েছে এবং সেই সকল স্থানেই এখন ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান আড্ডা হ'য়েছে। কচুরীপানার জন্য বাঙ্গালাদেশের লোকের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। যতদিন পর্য্যন্ত তা'কে একেবারে পরিষ্কার না করা যাবে, ততদিন বাঙ্গালাদেশে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা যাবে।

বাঙ্গালাদেশে খাল, বিল অনেক আছে, এবং পূর্ব্বে সেই সকল খাল, বিল দিয়ে নৌকা ক'রে একস্থান হ'তে আর

একস্থানে খুব সহজেই যাওয়া যেত। কিন্তু কচুরীপানার কৃপায় এখন অনেক খাল-বিলে নৌকা আর চলে না এবং তা'তেই বাঙ্গালাদেশের অনেক জলপথ প্রায় বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

এই সকল হ'ল কচুরীপানার অপকারিতা; কিন্তু ভগবান যা সৃষ্টি করেন তা' কখনও বিফলে যায় না—কচুরীপানার উপকারিতাও আছে। অনেক গবেষণার পরে একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক'রেছেন যে, এই কচুরীপানা হ'তে রাসায়নিক উপায়ে "ইবোনাইট্" (Ebonite) পাওয়া যায়। "ইবোনাইট্" একপ্রকার কুচ্‌কুচে কাল এবং খুব শক্ত কাঠ। এই "ইবোনাইট্" ইলেক্‌ট্রিক্ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য অনেক রকম জিনিষ প্রস্তুত ক'র্‌তে লাগে। কচুরীপানা হ'তে রাসায়নিক উপায়ে "ইবোনাইট্" প্রস্তুত ক'রে, সেই "ইবোনাইট্" অনেক কাজে লাগান যেতে পারে।

কচুরীপানার আরও একটি উপকারিতা আছে। কচুরীপানা জল হ'তে তুলে ফেলার পরে সেগুলো ক্রমশঃ একেবারে শুকিয়ে যায়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, সেই মরা, শুক্‌নো কচুরীপানা ক্ষেতে সার দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাঙ্গালাদেশ হ'তে কচুরীপানা একেবারে নির্ম্মূল করার জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকেরা এখন খুব চেষ্টা ক'র্‌ছে। বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে এখন যথেষ্ট সতর্ক হ'য়েছেন এবং কচুরী-পানার উচ্ছেদ সাধনের জন্য একটি আইনও প্রণয়ন ক'রেছেন।

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি

জলপ্রপাত কা'কে বলে তা' বোধ হয় তোমাদের জানা আছে। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জলপ্রপাত দেখেছও। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই জলপ্রপাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সমতল ভূমির নদী-পথ অপেক্ষা পার্ব্বত্য নদী-পথেই জলপ্রপাত বেশী দেখা যায়। যে সকল নদী সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে চ'লে যায়, তা'দের মধ্যে জলপ্রপাত ক্বচিৎ দেখা যায়; কিন্তু যে সকল নদী পার্ব্বত্য পথে, পাহাড়-পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসে, তা'দের পথেই জলপ্রপাত খুব বেশী।

সাধারণ লোকে জলপ্রপাত দেখে মনে করে এইটি প্রকৃতির একটি খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়। নদী চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে হঠাৎ খুব উঁচু থেকে একেবারে শত শত ফুট নীচে এসে প'ড়্‌ছে। ইহাকে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? তোমরাও হয়তো ভাব্‌ছ যে—এতে আর আমাদের কি কাজই বা হয়? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা কোনও জিনিষকে "বাজে" বা "অকেজো" ব'লে ফেলে রাখেন না। তাঁরা সকল জিনিষকেই পৃথিবীর এবং মানবজাতির কল্যাণে লাগিয়ে দেন।

বিজ্ঞানের শক্তিবলে জলপ্রপাতকেও মানুষের কাজে

লাগানো সম্ভবপর হ'য়েছে। জলপ্রপাতকে এখন আর কেবল-মাত্র উদ্দাম প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল ভেবে চুপ ক'রে থাকা হয় না। জলপ্রপাতের সাহায্যে এখন ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। জলপ্রপাতের ঠিক নীচে বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী ডায়নামোর (Dynamo) 'টার্‌বাইন' (Turbine) অথবা একপ্রকার চাকা বসানো সম্ভবপর হ'য়েছে। প্রপাতের জলধারা খুব উঁচু থেকে টার্‌বাইনের উপর পড়া মাত্রই চাকা ঘুর্‌তে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডায়নামো চল্‌তে থাকে। ডায়নামো চল্‌লেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই উপায়ে উৎপন্ন বিদ্যুৎ সাধারণ বিদ্যুতের ন্যায় মানুষের বহু কাজে লাগানো যায়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রপাতের জলধারার সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতের নাম দিয়েছেন হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি (Hydro-Electricity) অর্থাৎ জল হ'তে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। আবার অনেকে ইহাকে বলেন ওয়াটার্‌-পাওয়ার্‌ (Water-Power) অর্থাৎ জলের শক্তি। ফরাসীরা এর আর একটি নাম দিয়েছে—হোয়াইট্‌ কোল্‌ (White Coal) অথবা শাদা কয়লা।

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রস্তুত ক'র্‌তে খরচা খুবই কম পড়ে; কারণ যতদিন প্রপাতের জলধারা থাক্‌বে ততদিন টার্‌বাইনের চাকা ঘুর্‌বে এবং ডায়নামোও চল্‌বে। ডায়নামো চ'ল্‌লেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; সুতরাং খরচা সামান্যই লাগে। যদি নদীর গতি বা পথ বদ্‌লিয়ে যায় অথবা অন্য কোন কারণে

প্রপাতের ধারা বন্ধ হ'য়ে যায়, কেবল তা' হ'লেই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু যতদূর দেখা গিয়েছে বা জানা আছে, তা'তে এখনও পর্য্যন্ত কোনও দেশে এই রকম কোনও কারণ ঘটেছে ব'লে জানা যায় নি। তবে অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে যে, গ্রীষ্মকালে নদীর জল ক'মে গেলে, প্রপাতের জলধারার বেগও ক'মে যায়, কিন্তু তা'তে কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা হয় না—হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি সমানভাবেই উৎপন্ন হ'তে থাকে।

এই উপায়ে পৃথিবীর অনেক প্রপাতকে কাজে লাগানো সম্ভবপর হ'য়েছে। বহুদিন ধ'রে যে সকল প্রপাত দেখে মানুষ শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছে অথবা আনন্দ পেয়েছে, যেগুলো পৃথিবীর কোনও কাজে লাগ্‌বে ব'লে কখনও ভাবে নি—এখন সেই সকল প্রপাতের সাহায্যেই জগতের কত উপকার হচ্ছে তা'র কথা এইবার তোমাদিগকে ব'ল্‌ছি।

আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিখ্যাত 'নায়গারা' প্রপাত এবং আরও অনেক প্রপাতের সাহায্যে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন ক'রে এখন তা'ই দিয়ে রাস্তায় আলো দেওয়া হচ্ছে—ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন, ময়দার কল, কাঠের কারখানা, কাগজের কল প্রভৃতিও চালানো হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকায় কানাডাতে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটির সাহায্যে এখন অনেক কাগজের কল, পাটের কারখানা এবং আরও অন্যান্য কল-কারখানা চালানো হচ্ছে।

নরওয়ে এবং সুইডেনে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তা'রই সাহায্যে কাগজের কল, কার্‌বাইডের কারখানা, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি চ'ল্‌ছে। সুইডেনে এত বেশী হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হয় যে, সেই দেশের সমস্ত কাজে লাগিয়েও অনেকটা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই

নায়গারা ফল্‌স্‌

উদ্বৃত্ত হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি সাধারণ বিদ্যুতের ন্যায় তামার তারের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে সুইডেনের ঠিক দক্ষিণস্থ ডেন্‌মার্ক দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তা'র সাহায্যে অনেক কল-কারখানা চালানো হয়।

ফ্রান্সেও হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি অনেক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বত এবং দক্ষিণ-

পশ্চিমে পিরিনীজ্‌ পর্ব্বতে অনেক জলপ্রপাত আছে ; সেগুলোর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ট্রেন, লোহা, ইস্পাত, সূতা এবং সিল্ক ফ্যাক্টরী চালানো হয়।

ইটালীর উত্তরে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের জলপ্রপাতগুলোর সাহায্যেও হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন করা হয় এবং তা' দিয়ে ইটালীর যাবতীয় লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল, সিল্ক ফ্যাক্টরী, ময়দার কল প্রভৃতি চালানো হচ্ছে।

সুইজার্‌ল্যাণ্ড্‌ দেশটি পর্ব্বতময় এবং সেই দেশে বহু হ্রদ আছে ; তা'র ফলে অনেক জলপ্রপাতের সৃষ্টি হ'য়েছে। সেই সকল জলপ্রপাতের সাহায্যে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন ক'রে ঘড়ির কারখানা, সূতা ও সিল্কের ফ্যাক্টরী চালানো হচ্ছে।

যে সকল দেশে কয়লা অথবা পেট্রোল পাওয়া যায় না, সেই সকল দেশে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটির সাহায্যে কল-কারখানা প্রভৃতি চালানো এখন খুবই সুবিধাজনক হ'য়েছে। ইটালী, সুইজার্‌ল্যাণ্ড্‌ প্রভৃতি দেশে কয়লা অথবা পেট্রোল একেবারেই নেই, অথচ কল-কারখানা চালাতে হ'লে হয় পেট্রোল, অথবা কয়লা চাইই। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই সকল দেশের লোকদের বিশেষ অসুবিধার ভিতর দিন কাটা'তে হ'ত। কিন্তু জগদীশ্বর তা'দের জন্য যে অন্য ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন তা' তা'রা তখনও টের পায় নি। সেই সকল দেশে বহু জলপ্রপাত আছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেগুলোকে তা'রা প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল ব'লে তুচ্ছ মনে ক'রে অগ্রাহ্য

ক'রে এসেছিল, কিন্তু এখন সেগুলোর সাহায্যেই তা'দের কল-কারখানা, ট্রেন, ট্রাম প্রভৃতি চল্‌ছে—রাত্রিতে বাতিও জ্বল্‌ছে।

কয়লা, পেট্রোল অথবা সাধারণ উপায়ে প্রস্তুত বিদ্যুৎ অপেক্ষা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি অনেকাংশে সস্তা। সুতরাং সেদিক থেকেও অনেক সুবিধা হ'য়েছে।

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটির মূল্য এত কম ব'লে এখন প্রত্যেক দেশই যতদূর সম্ভব হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন ক'রে—সস্তায় নিজেদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশেও অনেক পরিমাণে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হ'য়ে থাকে।

আজকাল আমাদের ভারতবর্ষেও বহু পরিমাণে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম দার্জ্জিলিঙেই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করা হয়। দক্ষিণ ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শিবসমুদ্রম্ নামক স্থানে কাবেরী নদীর একটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। সেই প্রপাতের সাহায্যে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন ক'রে ঐ স্থানের কিছু দূরে—মহীশূরের অন্তর্গত কোলার নামক স্থানের সোনার খনি চালানো হয়। আসাম প্রদেশের রাজধানী শিলং সহরের নিকটস্থ উম্‌খ্রা নামক পার্ব্বত্য নদীর পথে 'বীডন্ ফল্‌স্' নামক একটি জলপ্রপাত আছে। বহু দিন হ'তে জনসাধারণ শুধু তা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই দেখে আস্‌ছিল; কিন্তু এখন ঐ বীডন্ ফল্‌স্-এর সাহায্যে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন ক'রে শিলং

সহরে এবং তা'র কাছাকাছি আরও অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সহরের রাস্তা, বাড়ী প্রভৃতিতে আলো জ্বালানো এবং পাখা, কল-কারখানা প্রভৃতিও চালানো হচ্ছে ঐ বীডন্ ফল্‌স্-এর সাহায্যে।

ভারতবর্ষে আরও অনেক স্থানে হাইড্রো-ইলেকৃট্রিসিটি উৎপন্ন করা সম্ভপর হ'য়েছে। সেই সকল স্থানের মধ্যে বোম্বাই
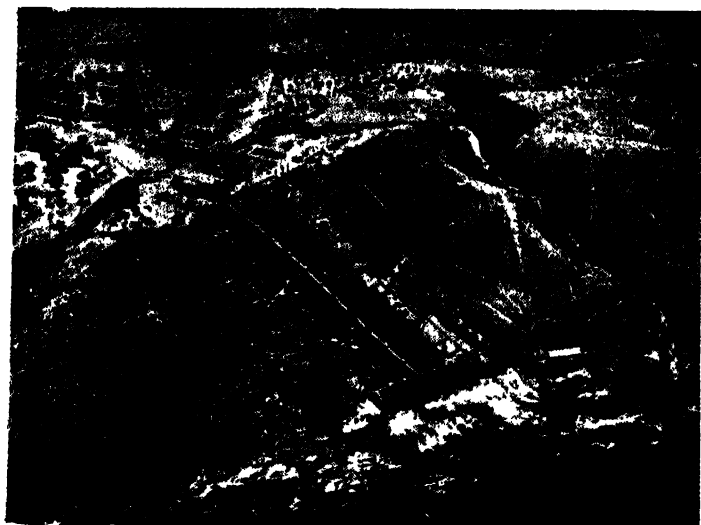
শিবসমুদ্রম্ হাইড্রো-ইলেকৃট্রিসিটি ওয়ার্কসের দৃশ্য (আকাশ হ'তে)

প্রদেশে টাটা কোম্পানীর পশ্চিমঘাট হাইড্রো-ইলেকৃট্রিসিটি সরবরাহের ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পাইকাড়া, পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডি প্রভৃতি স্থানেও

হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করা হয় এবং তা'রই সাহায্যে বহু কল-কারখানা চালানো হয়।

ভারতবর্ষে এতগুলো বৃহৎ বৃহৎ জলপ্রপাত আছে যে, হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে তা'দের সাহায্যে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন ক'রে এখনও অনেক কাজে লাগানো

বীড্‌ন্‌ ফল্‌স্‌

যেতে পারে। কিন্তু তা'দের সকলকে এখনও কাজে লাগানো হয় নি ; তবে আশার কথা এই যে, গভর্ণমেণ্ট্‌ এবং জনসাধারণ এখন সেই দিকে খুব মন দিয়েছেন।

যে সকল দেশে স্বাভাবিক জলপ্রপাত একেবারেই নেই অথবা খুব কম আছে, সেই সকল দেশে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা হয়। নদীর পথে আড়া-আড়িভাবে একটা উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়, তা'তে নদীর জল জমা হ'য়ে সেই বাঁধ ছাপিয়ে নীচে পড়ে। এই উপায়ে কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয় এবং তা'রই সাহায্যে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করা হয়। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে এই রকম কৃত্রিম প্রপাতের সৃষ্টি ক'রে বহু পরিমাণে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষেও পাইকাড়া নামক স্থানে কৃত্রিম জলপ্রপাতের সাহায্যেই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহ করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ড্‌ এবং আফ্রিকাতে বহু বৃহৎ বৃহৎ জলপ্রপাত আছে; কিন্তু সেগুলোকে এখনও কাজে লাগানো হয় নি—হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে সেগুলোকেও কাজে লাগানো হবে।

লিগ্‌নাইট্‌

তোমরা অনেকেই বোধ হয় লিগ্‌নাইটের নাম শোন নি—আর যদিও নাম শুনে থাক, বোধ হয় তা' চোখে দেখ নি। লিগ্‌নাইট্ জিনিষটি কি সেই সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌ব। লিগ্‌নাইট্ (Lignite) একরকম পাথুরে কয়লা—দেখ্‌তে পাট্‌কিলে রংয়ের—তা'রই নাম লিগ্‌নাইট্ অথবা "ব্রাউন কোল্।"

এই কয়লা জ্বালানি কাজে লাগে না, এবং অন্য কোনও কাজেও ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু তাই ব'লে সেগুলোকে ফেলেও দেওয়া যায় না। অনেক মাথা ঘামিয়ে জার্ম্ম্যাণ বৈজ্ঞানিক এবং রাসায়নিকগণ লিগ্‌নাইট্‌কে কাজে লাগাবার এক উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন। লিগ্‌নাইট্‌কে রাসায়নিক উপায়ে গ'লিয়ে ফেলে তা' হ'তে এক রকম তেল পাওয়া যায়। জার্ম্মেণীর স্যাক্সনি (Saxony) ও থুরিঙ্গিয়া (Thuringia) প্রদেশে লিগ্‌নাইট্ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সেগুলো কোনও কাজেই ব্যবহার করা যেত না; কিন্তু এখন জার্ম্মেণীতে ঐ উপায়ে লিগ্‌নাইট্ হ'তে অনেক তেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। জার্ম্ম্যাণরা ঐ তেলের নাম দিয়েছে 'ডিজেল্ অয়েল্' (Diegel Oil) অথবা ডিজেল্ তেল। জার্ম্মেণীতে পেট্রোল পাওয়া যায় না—কিন্তু জার্ম্ম্যাণরা ডিজেল্ তেল দিয়ে সে অভাব দূর ক'রেছে।

ডিজেল্ তেল দিয়ে এঞ্জিন, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি চালানো যায়, এবং পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে ডিজেল্‌ তেলে চালাবার জন্য আলাদা রকমের এঞ্জিন অথবা মোটর চাই; সাধারণ মোটরে ডিজেল্‌ তেল ব্যবহার করা যায় না, এবং সেইজন্যই ডিজেল্‌ তেল প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের নূতন এঞ্জিন, মোটর, যন্ত্রপাতিও তৈরী করা হ'য়েছে। আজকাল অনেক দেশে পেট্রোল এঞ্জিন অথবা পেট্রোল মোটরের বদলে ডিজেল্‌ এঞ্জিন অথবা ডিজেল্‌ মোটর ব্যবহার করা হচ্ছে—তা'তে খরচা অনেক কম হয়। এ বিষয়ে জার্ম্মেণীই অগ্রগণ্য।

এখনও পর্য্যন্ত এরোপ্লেন পেট্রোল মোটরেই চলে; কিন্তু তা'তে খরচা অনেক বেশী পড়ে। ডিজেল্‌ মোটরে এরোপ্লেন চালানো হ'লে খরচা অনেক কম হবে ব'লে আজকাল পেট্রোল মোটরের বদলে ডিজেল্‌ মোটরে এরোপ্লেন চালাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও পর্য্যন্ত খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় নি; কারণ ডিজেল্‌ মোটরগুলো পেট্রোল মোটরের চেয়ে অনেক ভারী। এইজন্য এখন এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্য হাল্কা রকমের ডিজেল্‌ মোটর আবিষ্কারের চেষ্টা চ'ল্‌ছে। যদি সেই চেষ্টা সফল হয়, এবং ডিজেল্‌ মোটর দিয়ে এরোপ্লেন চালান যায়, তা' হ'লে এরোপ্লেনে যাওয়া আসার খরচা খুব ক'মে যাবে।

এইবার পাথুরে কয়লার আর একটি ব্যবহারের কথা ব'ল্‌ব। খনি হ'তে পাথুরে কয়লা তোলা হ'লে সেগুলো দেশে-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। সেই সময়ে উঠানো, নামানো বা

ঢালাঢালি করার সময়ে অনেক কয়লা গুঁড়ো হ'য়ে যায়। সেই গুঁড়ো কয়লা বাজারে বিক্রয় হয় না; কারণ গুঁড়ো কয়লা জ্বালাবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। কিন্তু আজকাল এই গুঁড়ো কয়লাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফ্রেডেরিক্ বর্জ্জিয়াস্ নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এক রকম রাসায়নিক উপায়ে পাথুরে কয়লা গ'লিয়ে ফেলে তা' হ'তে পেট্রোল তৈরী করার উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন। তাঁ'রই নামানুসারে সেই উপায়ে পাথুরে কয়লা হ'তে পেট্রোল তৈরী করার ব্যবস্থার নাম রাখা হয়েছে 'বর্জ্জিয়াস্ প্রসেস্' অথবা বর্জ্জিয়াস্ প্রক্রিয়া। যে সকল গুঁড়ো কয়লা বাজারে বিক্রয় করা যায় না, সেগুলো গ'লিয়ে ফেলে তা' হ'তে এখন পেট্রোল তৈরী করা হচ্ছে। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এই উপায়ে ৭,৫০,০০০ গ্যালন কৃত্রিম পেট্রোল তৈরী করা হ'য়েছিল। সেই পেট্রোল সাধারণ পেট্রোলের মত মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতি সব যন্ত্রেই এবং সকল কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে পেট্রোল পাওয়া যায় না, কেবল কয়লা পাওয়া যায়, সেই সকল দেশে পেট্রোলের অভাব পূরণ করা এখন খুবই সহজ হ'য়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে পেট্রোল খুব সামান্য পাওয়া যায়—কিন্তু কয়লা অনেক আছে, সেইজন্য আমাদের দেশেও বর্জ্জিয়াস্ প্রক্রিয়াতে কয়লা থেকে পেট্রোল তৈরীর কথা চ'ল্‌ছে; বোধ হয় শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

মিথেন

শনিবার দিন "ক্যাল্‌কাটা" এবং "মোহনবাগানে" খুব জোর ফুটবল ম্যাচ্‌ হ'য়ে গিয়েছে এবং সেই খেলাতে মোহন-বাগান ক্যাল্‌কাটাকে দুই গোলে হারিয়েছে। রবিবার সকালে "আনন্দবাজার পত্রিকা"খানা বাড়ীতে আসামাত্রই কমল এবং নীরু মোহনবাগানের খেলার সম্বন্ধে কাগজে কি লিখেছে তা'ই
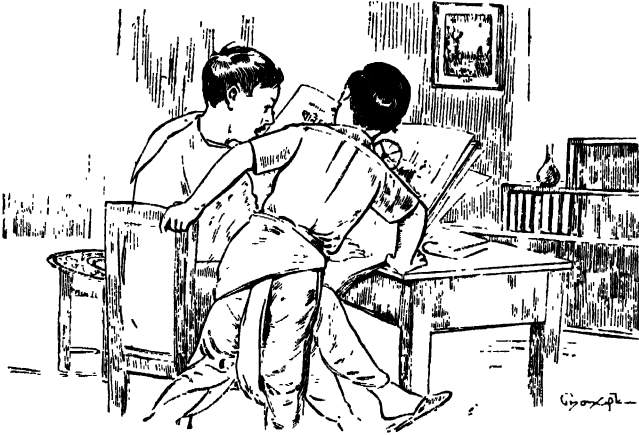
দেখার জন্য যেমনি তাড়াতাড়ি কাগজটি খুলেছে অমনি প্রথমেই নজরে প'ড়্‌ল বড় বড় অক্ষরে লেখা—"লয়াবাদে কয়লার খনিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—শত শত মজুর আহত।"

এই দেখে মোহনবাগানের খেলার খবর আর পড়া হ'ল না—তা'রা ছ'জনেই একেবারে দম বন্ধ ক'রে সেই অগ্নিকাণ্ডের কথাই প'ড়্তে লাগ্‌ল। প'ড়্তে প'ড়্তে দেখ্‌তে পেল লেখা র'য়েছে যে, খনির মধ্যে এক স্থানে "মিথেন" গ্যাস্ খানিকটা জমা হ'য়েছিল এবং সেই গ্যাসে আগুন লাগার ফলেই অত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘ'টেছে।

তা'ই দেখে কমল একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে নীরুকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল,—"মিথেন গ্যাস্‌টি আবার কি জিনিষ!"

নীরুও কমলের মত অবাক্ হ'য়ে উত্তর দিল,—"কি জানি 'মিথেন' আবার কি জিনিষ; নামটিও ত সম্পূর্ণ নূতন ব'লে মনে হচ্ছে।"

"খবরের কাগজ দিয়ে গিয়েছে নাকি?" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নীরুর বাবা সেখানে এলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—এই ব'লে কমল খবরের কাগজটি তাঁ'র হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল,—"মিথেন কি জিনিষ, কাকাবাবু?"

নীরুর বাবা উত্তর দিলেন,—"মিথেন এক রকম গ্যাস্। তোমরা সহরের ছেলে,—তোমরা মিথেনের নাম আর কি ক'রে জান্‌বে! মিথেন কি জিনিষ তা'ও তোমরা জান না!"

"আজ্ঞে না"—ব'লে কমল ও নীরু পড়ার ঘরে চ'লে গেল—মোহনবাগানের খেলার খবর দুপুরবেলা ভিন্ন আর পড়া হ'বে না।

তোমরাও খুব সম্ভবতঃ মিথেনের নাম শোন নি এবং মিথেন

কি জিনিষ তা'ও জান না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যা'দের বাড়ী পল্লীগ্রামে, তা'দের হয়তো খুব নিকটেই মিথেন আছে, অথচ তোমরা মিথেন কি জিনিষ জান না। আবার তোমরা হয়তো অনেকেই মিথেন দেখেছ, কিন্তু সেইটি যে মিথেন তা' জান না। এই মিথেন জিনিষটি কি এবং কোথায়, কি ভাবে পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'-চার কথা ব'ল্‌ছি।

বর্ষাকালে অনেক গাছ্‌পালা, গাছের ডাল, লতা-পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ একেবারে জলমগ্ন হ'য়ে যায়

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে বর্ষাকালে অনেক গাছপালা, গাছের ডাল, লতা-পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ একেবারে জলমগ্ন হ'য়ে যায় এবং সেগুলো জলের তলে চার-পাঁচ মাস ধ'রে প'চ্‌তে থাকে। জলের তলে বাতাস মোটেই নেই এবং

বাতাসের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদ্ এইভাবে প'চ্‌তে থাক্‌লে এক রকম গ্যাস্ আপনা-আপনিই উৎপন্ন হয়; সেই গ্যাসেরই নাম মিথেন (Methane)। বদ্ধ, স্রোতহীন এবং মরা খাল, বিল অথবা পুষ্করিণী এবং জলা জায়গাতেও মিথেন উৎপন্ন হয়।

স্রোতহীন এবং মরা পুকুরের তলাতে একটি বাঁশ দিয়ে নাড়া দেওয়া হচ্ছে

এইজন্য মিথেনের আর একটি নাম মার্শ গ্যাস্ (Marsh Gas) অর্থাৎ জলা জায়গা হ'তে উৎপন্ন গ্যাস্।

মিথেন অথবা মার্শ গ্যাস্ যে পুষ্করিণী, খাল প্রভৃতি স্থানে জন্মায় তা' তোমরা নিজেরাই অনায়াসে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার। বাড়ীর সংলগ্ন কিংবা অন্য কোনও পুরাণ এবং স্রোতহীন পুষ্করিণীর তলাতে একটি বড় লাঠি অথবা বাঁশ দিয়ে নাড়া দিলে জলের উপরে গ্যাসের বুদ্বুদের মত উঠ্‌তে থাক্‌বে। এই বুদ্বুদগুলো একটি গ্যাস্ রাখার পাত্রে ভর্ত্তি ক'রে রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেই প্রমাণিত হবে যে, এই গ্যাস্‌টি মার্শ গ্যাস্ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মার্শ গ্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, এই গ্যাস্ অক্সিজেন কিংবা বাতাসের সংস্পর্শে আস্‌লে এবং কোনও রকমে এই মিশ্রিত গ্যাসে আগুন লাগ্‌লে ভীষণ জোরে শব্দ হয় এবং মার্শ গ্যাস্ জ্বল্‌তে থাকে। এইজন্য রাসায়নিকগণ মার্শ গ্যাস্‌কে ফায়ার্ ড্যাম্প্ (Fire Damp) ব'লে থাকেন।

কয়লার খনিতেও মার্শ গ্যাস্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাশিয়ার অন্তর্গত "বাকু" (Baku) নামক স্থানের পেট্রোলের খনি এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত "ওহিও" (Ohio) নামক স্থানের পেট্রোলের খনিতেও মিথেন অনেক পরিমাণে আছে। এই দুই স্থানে মিথেনকে "ন্যাচুরাল্ গ্যাস্" (Natural Gas) অথবা স্বাভাবিক গ্যাস্ বলা হয়।

তোমরা খুব সম্ভবতঃ জান যে, কয়লার খনিতে প্রায়ই আগুন লাগে এবং এই আগুন লাগার ফলে অনেক কয়লার খনি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। কয়লার খনিতে আগুন

লাগার সঙ্গে মার্শ গ্যাস্ বা মিথেনের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে। মার্শ গ্যাসের মত কয়লারও উৎপত্তি উদ্ভিদ্ হ'তেই। বহুকাল পূর্ব্বেকার উদ্ভিদ্ দীর্ঘকাল মাটি চাপা প'ড়ে থাকার জন্য ক্রমে কয়লাতে পরিণত হ'য়েছে; সুতরাং কয়লার খনিতে মার্শ গ্যাস্ জন্মাবে তা' অত্যন্ত সাধারণ কথা এবং পূর্ব্বেই তোমাদিগকে ব'লেছি যে কয়লার খনিতে মার্শ গ্যাস্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই মার্শ গ্যাস্, কয়লার মধ্যে যে সকল শত সহস্র সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তা'দেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কয়লা কাটা হ'লে কুলীরা সেই কয়লা খনি হ'তে উপরে পাঠিয়ে দেয়। এই সময়ে মার্শ গ্যাস্ নাড়াচাড়া পেয়ে কয়লার ছিদ্র হ'তে বা'র হ'য়ে খনির ভিতর জমা হয়। এই রকমে অনেক পরিমাণে মার্শ গ্যাস্ জমা হ'য়ে থাকে এবং এই গ্যাস্ ক্রমে বাতাসের সংস্পর্শে এসে দাহ্য (Inflammable) গ্যাস্ হ'য়ে থাকে। এই অবস্থায় কুলীদের সঙ্গেকার আলোর দীপশিখা অথবা অন্য কোনও ভাবে আগুনের সামান্য ছোঁয়াচ্ লাগ্‌লেই হ'ল—ব্যস্! আর কথা নেই—মার্শ গ্যাস্ ত জ্বল্‌তে থাক্‌বেই, সেই সঙ্গে কয়লার খনিতেও আগুন লেগে যাবে এবং তা'র ফলে কত লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লা ও কত শত কুলীর প্রাণ একেবারে নষ্ট হবে। কয়লার খনিতে এই রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং তা'র প্রধান কারণ মার্শ গ্যাসের উপস্থিতি।

তোমাদের মধ্যে যা'দের বাড়ী পল্লীগ্রামে, তা'রা

"আলেয়া"র নাম নিশ্চয়ই শুনেছ—হয়তো কেহ কেহ বা "আলেয়া" দেখেছও। এই আলেয়া জিনিষটি সত্য সত্য যে কি তা' তোমরা অনেকেই জান না। পল্লীগ্রামাঞ্চলে স্রোতহীন

"আলেয়া" দেখে পথিক ভয়ে পালাচ্ছে

এবং মরা খাল, বিল, জলা জায়গা বহু আছে। এই সকল জলা জায়গাতে মার্শ গ্যাস্ বা মিথেন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস্ জলা জায়গার তলদেশ হ'তে ক্রমশঃ উপরে

উঠে' আশেপাশে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের সঙ্গে ক্রমশঃ মিশে গিয়ে দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয়। এই রকম অবস্থায় থাকার সময়ে এই গ্যাস্ যদি কোনও প্রকারে আগুন বা দীপশিখার সংস্পর্শে আসে,—ব্যস্! অমনি মার্শ গ্যাস্ জ্ব'ল্‌তে সুরু করে। কোনও পথিক হয়তো এই জলা জায়গার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখ্‌তে পেল যে জলের উপরে আপনা-আপনিই আগুন জ্বল্‌ছে! প্রথমে সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করে, কিন্তু ক্রমে তা'র মনে ধ্রুব-বিশ্বাস জন্মে যায় যে, এইটি নিশ্চয়ই কোনও ভৌতিক ব্যাপার—তা' না হ'লে জলা জায়গার উপরে আপনা-আপনিই আগুন জ্বলে কি ক'রে! এই সমস্ত মনে ক'রে পথিক আর সে পথ দিয়ে যায় না। সমস্ত গ্রামময় এই খবর ছড়িয়ে প'ড়্‌ল এবং ক্রমশঃ ব্যাপার এই রকম দাঁড়া'ল যে, ঐ জলা জায়গার নিকটে আর কা'রও যেতে সাহস হয় না। সকলেরই মনে ভয় হয় এই বুঝি ভূত এসে ঘাড় মট্‌কাবে! কিন্তু সত্যকার ব্যাপারটি যে কি তা' তোমরা এখন বোধ হয় ভাল রকমই বুঝ্‌তে পেরেছ। লোকে এই জিনিষটির নাম দিয়েছে "আলেয়া"। এই আলেয়ার নাম শুন্‌লেই সাধারণ লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

আলেয়ার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই জিনিষটি একস্থানে থাকে না—সমস্ত জলা জায়গাময় ঘুরে বেড়ায়। এই রকম করার একমাত্র কারণ এই যে, মার্শ গ্যাস্ জলের তলদেশ হ'তে উপরে উঠে' একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না

এবং তা' থাকাও সম্ভবপর নয়। মার্শ গ্যাস্ জলা জায়গার চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা'র ফলে আগুনও একস্থানে জ্বল্‌তে পারে না। একস্থানে যতটুকু গ্যাস্ জমা হ'য়ে আছে ততটুকু জ্ব'লে শেষ হ'য়ে গেলে, অমনি আর একস্থানে যে গ্যাস্‌টুকু জমা হ'য়ে আছে সেইটুকু জ্বল্‌তে আরম্ভ করে; কখনও কখনও বা এক সঙ্গেই দু-তিন স্থানেই জ্বল্‌তে স্নুরু করে। এইজন্য লোকে বলে যে আলেয়া ঘুরে ফিরে বেড়ায় এবং এইটি যে ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে সে সম্বন্ধে তা'রা স্থির-নিশ্চয় হ'য়ে থাকে।

রেয়োঁ

শনিবার বেলা দু'টোর সময়ে স্কুল ছুটী হয়। ঠিক দু'টোর সময়ে ঘণ্টা বাজা মাত্রই তপন বইগুলো হাতে ক'রে নিয়ে যেমনি তাড়াতাড়ি ক্লাশ হ'তে বাইরে যাবে অমনি দরজার লোহার কড়ায় তা'র পাঞ্জাবীর পকেট বেধে গিয়ে ফ্যাঁ—স্ ক'রে খানিকটা ছিঁড়ে গেল।

"এই যা—জামাটা ছিঁড়ে গেল!—" ব'লে তপন সেই ছেঁড়া জায়গাটা দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

"কি হ'য়েছে, তপন?" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সলিল তা'র কাছে এল।

তপন তা'র ছেঁড়া পাঞ্জাবীটি দেখিয়ে ব'ল্‌ল,—"জামাটা এক্ষুণি ছিঁড়ে গেল,—তা'ই দেখ্‌ছি। নূতন জামা এইরকম ভাবে ছিঁড়ে গেল!—মা যে খুব ব'ক্‌বেন বাড়ী গেলে!"

এমন সময়ে অনীশও তা'র বই হাতে ক'রে ক্লাশের বাইরে যাচ্ছিল। তপনের কথা শুনে সে ব'লে উঠ্‌ল,—"হ্যাঁ! ভা—রী ত একটা রেয়োঁর জামা—তা'ই ছিঁড়ে গেছে, তা'র জন্য আবার এত ভাবনা! তবু যদি সিল্কের জামা হ'ত!"

"রেয়োঁ!—সে কি জিনিষ ভাই!" ব'লে সলিল অনীশের মুখের দিকে তাকা'ল।

অনীশ অমনি বিজ্ঞের মত উত্তর দিল,—"তা' জান না বুঝি! তোমরা তবে জান কি? রেয়োঁ মানে কৃত্রিম

অথবা নকল সিল্ক। এই যে সকলের গায়ে আজকাল সিল্কের মত এক রকম মোটা এবং খুব চক্‌চকে, সস্তা কাপড়ের সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি দেখ্‌তে পাও, সেই কাপড়ের নামই রেয়োঁ।”

“তা'ই নাকি!” ব'লে সলিল একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে তপনের পাঞ্জাবীটি হাত দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

“আবার হাত দিয়ে দেখ্‌ছ কি—তপনের পাঞ্জাবী ত রেয়োঁ থেকেই তৈরী করা হ'য়েছে;” ব'লে অনীশও হন্‌ হন্‌ ক'রে বাইরে চ'লে গেল।

সলিলের মত তোমরাও অনেকেই রেয়োঁ কি জিনিষ তা' বোধ হয় জান না। তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই রেয়োঁ থেকে প্রস্তুত সার্ট, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি প্রভৃতি গায়ে দিয়ে থাক, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ রেয়োঁ কি জিনিষ তা' তোমাদের জানা নেই। আবার তোমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে যা'রা রেয়োঁর নাম পর্য্যন্ত শোনে নি এবং লোকের মুখে রেয়োঁর নাম শুনে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত বোধ করে। কিন্তু রেয়োঁ আজকাল এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছে এবং সর্ব্বসাধারণ লোক রেয়োঁ এত বেশী ব্যবহার ক'র্‌ছে যে, রেয়োঁ কি জিনিষ এবং কি ভাবে রেয়োঁ প্রস্তুত হয় তা' না জান্‌লে আর চলে না। রেয়োঁ কি জিনিষ সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'ল্‌ছি।

তোমরা অনেকেই সিল্কের জামা, গেঞ্জি প্রভৃতি গায়ে দিয়েছ এবং সিল্ক কি উপায়ে প্রস্তুত হয় তা'ও বোধ হয় তোমরা জান। রেশম-পোকা অথবা এক রকম গুটীপোকার মুখ হ'তে নির্গত

লালা থেকেই সিল্কের সূতা পাওয়া যায়। সেই সূতা হ'তে তাঁতের সাহায্যে কাপড় অথবা সিল্কের থান প্রস্তুত করা হয় এবং তা' দিয়ে জামা প্রভৃতি তৈরী করা হয়—এই সকল কথা বোধ হয় তোমাদের জানা আছে। এই উপায়ে প্রস্তুত সিল্ককে "রেশম", "আসল সিল্ক" অথবা শুধু "সিল্ক" ব'লে থাকে। কিন্তু এই আসল সিল্কেরই মত আজকাল একরকম সিল্ক প্রস্তুত করা হচ্ছে, তা'র নাম কৃত্রিম বা নকল সিল্ক।

বর্ত্তমান যুগে রাসায়নিক উপায়ে এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনেক প্রকার কৃত্রিম জিনিষই প্রস্তুত করা সম্ভবপর হ'য়েছে এবং এই উপায়ে কৃত্রিম সিল্কও প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই কৃত্রিম বা নকল সিল্কেরই আর একটি নাম—রেয়োঁ।

কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার কল্পনা সর্ব্বপ্রথম রিউমার্ (Reaumer) নামক একজন ফরাসী পদার্থবিদের মাথায় আসে। তিনি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় দু'শ' বছর পূর্ব্বেই কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার কথা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন। সিল্ক সম্বন্ধে তিনি ব'লেছিলেন যে,—সিল্ক এক প্রকার চট্‌চটে আঠা ভিন্ন আর কিছুই নয়; এই চট্‌চটে আঠা শুক্‌নো অবস্থায় আস্‌লেই সিল্ক হয়। তা' হ'লে আমরাও এইরূপ চট্‌চটে আঠা হ'তে সিল্ক প্রস্তুত ক'র্‌তে কেন পার্‌ব না! কিন্তু রিউমার্ তাঁ'র এই রকম অভিমত কার্য্য দ্বারা প্রমাণ ক'র্‌তে পারেন নি। রিউমারের পরে অনেকেই কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁ'রা কেহই সফল-মনোরথ হ'তে পারেন নি। শেষ

পর্য্যন্ত কাউন্ট্ হিলারে দ্য কার্ডোনেট্ (Count Hilaire de Chardonnet) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকই কৃত্রিম উপায়ে সিল্ক প্রস্তুত করার প্রথা আবিষ্কার করেন এবং তাঁ'কেই কৃত্রিম সিল্কের জন্মদাতা বলা হয়।

কাউন্ট্ হিলারে দ্য কার্ডোনেট্
(Count Hilaire de Chardonnet)

কার্ডোনেট্ একজন অনুসন্ধিৎসু এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার প্রথা আবিষ্কার ক'র্‌তে তাঁ'কে

বহু পরিশ্রম ক'র্তে হ'য়েছিল। তাঁ'র ছাত্রাবস্থায় তিনি জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের (Pasteur) ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে পাস্তুর গুটীপোকার রোগসম্বন্ধে গবেষণা ক'র্‌ছিলেন এবং কার্ডোনেট্‌ও পাস্তুরের সঙ্গে একত্রে কাজ ক'র্‌তেন। এই সময়ে প্রত্যহই অনেক গুটীপোকা নিয়ে

গুটীপোকা এবং তুত্‌ গাছের পাতা—গুটীপোকা তুত্‌গাছের পাতা খাচ্ছে

তিনি নাড়াচাড়া ক'র্‌তেন এবং গুটীপোকা কি ভাবে আপনার দেহ হ'তে সিল্কের সূতা বা'র করে তা'ই দেখে কার্ডোনেটের মাথায় নূতন খেয়াল উপস্থিত হ'ল।

তোমরা বোধ হয় জান যে, গুটীপোকা মাল্‌বেরী

(Mulberry) অর্থাৎ তুত্ এবং বিলাতী ওক্ (Oak) গাছের পাতা খায় এবং তা'ই তা'র একমাত্র খাদ্য। এইসকল পাতা গুটীপোকার দেহের ভিতর গিয়ে একরকম তরল এবং চট্‌চটে আঠায় পরিণত হয়। সেই আঠা আবার গুটীপোকার মুখের একপ্রকার খুব সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাইরে আসে এবং

গুটীপোকা সিল্কের গুটী তৈরী ক'রেছে

অত্যন্ত সরু সূতার আকারে গুটীপোকার দেহের চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। এই সময়ে হাওয়ার সংস্পর্শে আসার জন্য সূতার মত ঐ সরু চট্‌চটে আঠা উজ্জ্বল এবং শক্ত সূতায় পরিণত হয়। এই সূতারই নাম সিল্ক।

কার্ডোনেট্ অনেকদিন ধ'রে গুটীপোকার এই সকল কার্য্য-প্রণালী দেখে মনে মনে স্থির ক'র্লেন যে রাসায়নিক জিনিষ-পত্র এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তিনিও গুটীপোকার মত ঐ ভাবেই কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত ক'র্বেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখ্লেন যে, যে সকল পাতা গুটীপোকা খেয়ে থাকে তা' সেলুলোজ্ (Cellulose) ভিন্ন আর কিছুই নয়। তা' হ'লে গাছের পাতা বা কাঠ হ'তে যে সেলুলোজ্ পাওয়া যায় তা'কে রাসায়নিক উপায়ে তরল এবং চট্‌চটে আঠায় পরিণত ক'রে এক রকম খুব সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বা'র ক'রে নিলেই সূতার মত সরু সরু, লম্বা সিল্কের সূতা প্রস্তুত করা যাবে না কেন!

এই রকম স্থির ক'রে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কার্ডোনেট্ কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ ক'র্লেন। গুটীপোকার জীবন-ধারণ এবং ভোজন-প্রণালী এবং কি উপায়ে তা'র দেহ হ'তে সিল্কের সূতা বা'র হয় এই সকল নিয়ে গবেষণা ক'র্তে কয়েক বছর কেটে গেল। মাল্‌বেরী অর্থাৎ তুত্‌গাছের পাতার রাসায়নিক গুণাবলী সম্বন্ধে গবেষণা ক'র্তেও আরও কিছুদিন গেল। অবশেষে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তুত্‌গাছের পাতা, ডালপালা প্রভৃতি হ'তেই রাসায়নিক উপায়ে কার্ডোনেট্ সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত ক'র্লেন। কিন্তু এই সিল্ক খুব ভাল হয় নি ব'লে তিনি বিশেষ কা'কেও দেখান নি। আরও পাঁচ বছর ধ'রে কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার প্রথা সম্বন্ধে

অনেক প্রকার গবেষণা করার পরে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস্ এক্জিবিসনে তিনি সর্ব্বসাধারণকে তাঁ'র প্রস্তুত কৃত্রিম সিল্ক দেখিয়েছিলেন। তাঁ'র এই আবিষ্কারে ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল এবং অনেক ধনী ব্যক্তিই কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার উপযুক্ত ফ্যাক্টরী অথবা কারখানা নির্ম্মাণ করার জন্য যথেষ্ট রকম টাকা দিতে রাজী হ'লেন। এই সকল ধনী লোকের সাহায্যেই কার্ডোনেটের জন্মস্থানে—উত্তর ফ্রান্সের অন্তর্গত বিসান্কন্ (Besancon) নামক সহরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার ফ্যাক্টরী স্থাপিত হ'ল।

এই ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ার পরে দু' বছরের মধ্যেই ফ্যাক্টরীর কাজ অনেক বৃদ্ধি পেল ও উন্নত হ'ল, এবং কৃত্রিম সিল্কের বহুপ্রকারের জিনিষপত্র প্রস্তুত হ'তে লাগ্ল, যা'তে ক'রে ফ্যাক্টরীর প্রচুর লাভ হ'ল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ফ্যাক্টরী খুব ভাল ভাবেই কাজ ক'রে আস্ছিল, কিন্তু সেই সময়ে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়াতে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট্ ঐ ফ্যাক্টরীটি কিনে নিয়ে সেখানে যুদ্ধের গুলি, গোলা প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ ক'রেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট্ ফ্যাক্টরীটি বিক্রয় ক'রে দিলেন এবং এখন পর্য্যন্তও সেখানে কৃত্রিম সিল্ক বহুপরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছে।

কাউণ্ট্ কার্ডোনেট্ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ রোম নগরীতে মারা যান। তিনি একজন উদ্যমী, পরিশ্রমী এবং অক্লান্তকর্ম্মী

ছিলেন এবং মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত কৃত্রিম সিল্ক সম্বন্ধে বহু গবেষণা এবং পরীক্ষা ক'রেছিলেন। তাঁ'র এই জীবনব্যাপী চেষ্টা এবং সাধনার জন্যই কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার প্রথা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হ'য়েছিল, যা'র ফলে বর্ত্তমান জগতের

রেয়োঁ প্রস্তুত করার জন্য তুলা এবং সূতা

লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হ'চ্ছে এবং কৃত্রিম সিল্ক আজকাল সর্ব্বসাধারণ লোকের একটি অত্যাবশ্যক জিনিষ হ'য়ে উঠেছে।

কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার জন্য সেলুলোজের প্রয়োজন। এই সেলুলোজ্ কাঠ, কাঠের গুঁড়ো, খড়, তুলা, কাগজ প্রভৃতিতে বহু পরিমাণে আছে ; কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে,

এই সকল জিনিষগুলোর মধ্যে, রেয়োঁ প্রস্তুত করার কাজে, কাঠ অথবা কাঠের গুঁড়ো এবং তূলাই ব্যবহার করার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী! তা' ছাড়া এই সকল জিনিষ-গুলোর মধ্যে কাঠ এবং তূলাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। আবার কাঠের মধ্যে "পপ্‌লার্‌" (Poplar), "ফার" (Fir),

রেয়োঁ প্রস্তুত করার জন্য "স্প্রুস্‌" (Spruce) গাছের কাঠ—গুঁড়ো করার জন্য কাঠের কলে রয়েছে

"স্প্রুস্‌" (Spruce), "বার্চ্চ" (Birch) প্রভৃতি গাছের কাঠ বা কাঠের গুঁড়োতেই সেলুলোজ্‌ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে।

কাঠের গুঁড়ো, তূলা প্রভৃতি প্রথমে ভাল ক'রে পরিষ্কার করা হয়। পরে ঔষধপত্রের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ'লিয়ে ফেলে নাইট্রো-সেলুলোজ্‌ নামক একটি পদার্থ পাওয়া

যায়। এই নাইট্রো-সেলুলোজ্, ইথার এবং অ্যাল্‌কোহল্ নামক দু'টি তরল রাসায়নিক জিনিষের সঙ্গে সংমিশ্রিত ক'রে পরিষ্কার করা হয় এবং এই ভাবে কিছুদিন রেখে দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে এই তরল পদার্থ চট্‌চটে আঠার মত হয়। তখন ঐ চট্‌চটে রাসায়নিক পদার্থটি পাম্পের সাহায্যে খুব চাপ দিয়ে অসংখ্য সরু, সরু ছিদ্রপথের ভিতর হ'তে বা'র করা
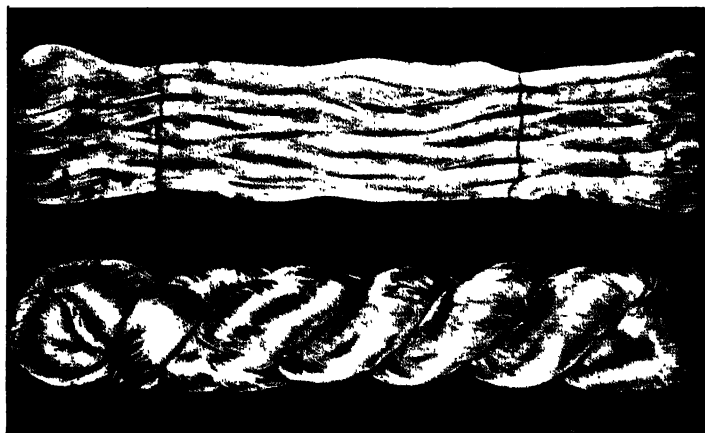
রেয়োঁ স্থতার ফেটী এবং বাণ্ডিল

হয় এবং তা'র ফলে ঐ চট্‌চটে আঠা খুব সরু সূতার আকারে বাইরে আসে। এই সময়ে সূতাগুলো অত্যন্ত পাত্‌লা থাকে এবং এই রকম কয়েকটি সূতা একত্র ক'রে যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাকিয়ে রীল্ (Reel) অথবা "মাকু"র গায়ে জড়ান হয়। এইভাবে কৃত্রিম সিল্কের সূতা প্রস্তুত হয়। এই সূতা পরে

শুকিয়ে ফেলে কাচা হয় এবং পরিষ্কার করা হয়—প্রয়োজন হ'লে রং করাও হয়। এই অবস্থায় সূতা খুবই উজ্জ্বল হয় এবং তাঁতের সাহায্যে এই সূতা হ'তে থান, কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। এই উপায়ে কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করার নাম কার্ডোনেট্ প্রক্রিয়া। আজকাল আরও দু'-তিন রকম প্রথাতে কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু কার্ডোনেট্ প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাণ'।

এই কৃত্রিম সিল্কের কি নাম রাখা যায় তা'ই নিয়ে বৈজ্ঞানিক এবং প্রস্তুতকারকগণের মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত খুব আলোচনা চ'লেছিল। কেহ কেহ এই বস্তুটির নাম রাখ্‌লেন, "গ্লান্‌জ" (Glanz)—আবার কেহ বা "লাষ্ট্রন্" (Lustron), "আর্ট-সিল্ক" (Art Silk) প্রভৃতি নাম রাখ্‌লেন, কিন্তু এতগুলো নামের মধ্যে একটিও সকলের পছন্দ হ'ল না। শেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতকারকগণ একটি সভাতে বহু তর্ক-বিতর্ক করার পরে এই জিনিষটির নাম "রেয়োঁ" (Rayon) রাখা স্থির ক'র্‌লেন। সেই সময় হ'তে "রেয়োঁ" নামই প্রচলিত হ'য়ে গেল এবং আজকাল "রেয়োঁ" কথাটি জানে না এমন লোক নেই ব'ল্‌লেই হয়। রেয়োঁর আরও একটি নাম আছে; রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয় ব'লে অনেকে রেয়োঁকে "কেমিক্যাল্" (Chemical) সিল্কও ব'লে থাকেন।

সিল্কের তুলনায় রেয়োঁ কম মজবুত। রেয়োঁ হ'তে প্রস্তুত

জামা, পোষাক প্রভৃতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং সকল রকম আবহাওয়ার পক্ষে উপযুক্তও নহে। দেখ্‌তে রেয়োঁ খুবই উজ্জ্বল—সিল্ক হ'তেও অধিকতর উজ্জ্বল এবং স্পর্শ ক'র্‌লেও সিল্ক ব'লে মনে হয়, কিন্তু সিল্কের তুলনায় রেয়োঁ অল্পসময়েই নষ্ট হ'য়ে যায়। একটি সিল্কের জামা যত দিন টেঁকে, অন্ততঃ দু'-তিনটি রেয়োঁর জামা হ'লে তবে ততদিন যাবে। তবে, সিল্কের মত রেয়োঁ ঘামে শীঘ্র বিবর্ণ হয় না এবং প'চে যায় না। সিল্কের কাপড়, জামা প্রভৃতিতে অনেক রকম রং করা যায় না, কিন্তু রেয়োঁতে নিজের ইচ্ছামত বহুপ্রকার রং করা যায়। রেয়োঁর প্রধান গুণ এই যে, রেয়োঁ খুবই সস্তা—সিল্কের দামের তুলনায় রেয়োঁর দাম প্রায় তিন-ভাগের এক ভাগ। লোকেরা জিনিষপত্র কেনার সময়ে সস্তার দিকেই বেশী নজর দেয়,—জিনিষটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে কিনা সে বিষয়ে খুব বেশী লক্ষ্য রাখে না। সুতরাং বাজারে সিল্ক অপেক্ষা রেয়োঁর চাহিদা অত্যন্ত বেশী। দিন দিন রেয়োঁ অধিকতর পরিমাণে বিক্রয় হচ্ছে।

রেয়োঁ যে কেবলমাত্র সার্ট, পাঞ্জাবীতে ব্যবহার করা হয় তা' নয়, গেঞ্জি, মোজা, গলাবন্ধ, লেস্, টেবল্‌ক্লথ্ প্রভৃতি বহুপ্রকারের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র প্রস্তুত করার কাজেও লাগে। তা' ছাড়া, আজকাল আবার সূতা এবং পশমের সঙ্গে রেয়োঁর সূতা মিশিয়ে কাপড়, পোষাক প্রভৃতিও তৈরী হচ্ছে, তা'তে ঐ সকল সূতী এবং পশমী জামা অথবা পোষাক দেখ্‌তে খুব সুন্দর হ'য়েছে।

রেয়োঁ প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কার করার পরে বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে মনে ক'রেছিলেন যে, এই কৃত্রিম সিল্ক প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠ্‌বে কেবল রেশমেরই। কিন্তু গত কয়েক বছরে রেয়োঁ প্রস্তুত করার জন্য অনেক প্রকার নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করা হ'য়েছে। সেই সকল যন্ত্রের সাহায্যে কোটি কোটি গজ রেয়োঁ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হ'য়েছে; ফলে, রেয়োঁর দাম এত কম হ'য়েছে যে, আজকাল রেয়োঁ সূতী কাপড়ের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা ক'র্‌ছে। সার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জামার সূতী কাপড় এখন পূর্ব্বেকার মত অত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় না—রেয়োঁই প্রস্তুত করা হচ্ছে। লোকেরাও সূতী জামার পরিবর্ত্তে খুব সস্তা দামেই রেয়োঁ বা কৃত্রিম সিল্কের জামা আনন্দিত মনে ব্যবহার ক'র্‌ছে।

রেয়োঁ প্রস্তুত করার শিল্প কত শীঘ্র এবং কত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এইবার সেই সম্বন্ধে ব'ল্‌ছি। গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে মোট সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৩৭৫০০ মণ (এক পাউণ্ড প্রায় আধ সেরের সমান) রেয়োঁ প্রস্তুত হ'য়েছিল। তা'রপর হ'তে রেয়োঁ বহুপরিমাণে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌ল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দশ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২৫০০০০ মণ রেয়োঁ প্রস্তুত হ'য়েছিল। কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৭৫ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৯৩৭৫০০০ মণ; ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৯০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১১২৫০০০০ মণ এবং গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে

১০০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২৫০০০০০ মণ রেয়োঁ প্রস্তুত হ'য়েছিল। এইসকল পরিমাণ হ'তেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়, গত দশ বছরে পৃথিবীতে কি পরিমাণ রেয়োঁ প্রস্তুত হ'য়েছে এবং লোকেও কি পরিমাণ রেয়োঁ বা কৃত্রিম সিল্ক ব্যবহার ক'র্‌ছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, যদি রেয়োঁর পরিমাণ এই রকমে প্রতি বছরই বাড়্‌তে থাকে তা' হ'লে খুব শীঘ্রই পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক সূতার এবং কাপড়ের কল বন্ধ হ'য়ে যাবে।

সূতী কাপড় কিংবা সিল্ক এই দু'টির সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে রেয়োঁর একটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, তা'দের মত রেয়োঁ প্রকৃতির বশবর্ত্তী নহে। যদি কোনও বছর ভাল বৃষ্টি না হয় অথবা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণ ঘটে, তা' হ'লে তূলার চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে পারে এবং তূলা ভালরকম উৎপন্ন নাও হ'তে পারে। যথেষ্ট রকম তূলা উৎপন্ন না হ'লে সূতা এবং কাপড়ের কল অচল হ'য়ে যাবে। আবার সিল্কের বেলাতেও এই রকম কোনও নৈসর্গিক কারণে যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে পারে। যদি কোনও বছর যথেষ্ট পরিমাণে তুত্‌গাছের পাতা না পাওয়া যায় কিংবা কোনও মড়ক লেগে অসংখ্য গুটীপোকা ম'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌ল, তা' হ'লে সেই বছর সিল্কের সূতা এবং সিল্ক খুবই কম পাওয়া যাবে। কিন্তু রেয়োঁর বেলাতে এই সকল কোনও উৎপাতই নেই—রেয়োঁ প্রস্তুত হয় রাসায়নিক উপায়ে। সুতরাং প্রকৃতির খেয়াল বা কোনও নৈসর্গিক কারণই রেয়োঁর বিশেষ কোনও ক্ষতি ক'রতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই রেয়ঁ৷ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেই সকল দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ইটালীই প্রধান। আবার এইসকল দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে

ইটালীর অন্তর্গত শ্যাটিলন্ (Chatillon) সহরের রেয়ঁ৷ ফাক্টরীর দৃশ্য

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রেয়ঁ৷ প্রস্তুত হয় এবং সেই রেয়ঁ৷ প্রায় সমস্তই ঐ দেশের লোকেরা ব্যবহার করে। ইংলণ্ড, জাপান, ইটালী, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডে যে পরিমাণ রেয়ঁ৷ প্রস্তুত হয় তা'র অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

রেয়োঁ প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অধিক আছে। সেইজন্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, খুব শীঘ্রই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিয়ে জাপান রেয়োঁ-শিল্পে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার ক'র্‌বে।

ভারতবর্ষে রেয়োঁ প্রস্তুত করার উপযোগী তূলা, কাঠ ও কাঠের গুঁড়ো প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এত সুবিধা সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রেয়োঁ প্রস্তুত হয় না। তোমরা যে সকল রেয়োঁ বা কৃত্রিম সিল্ক দেখ্‌তে পাও তা' সমস্তই বিদেশ হ'তে আসে। জাপান এবং ইংলণ্ড হ'তে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রেয়োঁ ভারতবর্ষে আসে ইটালী, বেল্‌জিয়াম্‌ এবং জার্ম্মেণী হ'তেও কিছু কিছু আসে। ভারতবর্ষে রেয়োঁ প্রস্তুত করার কোনও ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নেই; তবে আশা হয় শীঘ্র এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ হ'তে পারে।

—শেষ—